ধর্ম্মীয় চেতনার বহু কথা

শ্রী অনিল মোহন কর

সূচীপত্র

নাম	পৃষ্টা নম্বর
কালো শরীর আলো	১
অমৃতের সন্ধ্যান পেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া	২
আমেরিকায় ভারতীয় সুষমা দেবীর সত্য আবিস্কার	৩
স্বামিজীর ১৮৯৪ খ্রীঃ আমেরিকা হতে মাদ্রাজের অভিনন্দের অভিনব স্বরণীয় জবাব	৪
শ্রীরাম-কৃষ্ণের কথার ভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্যের মত লড়্গান প্রকাশ পেতে	৫
মায়ের শাসন মেনে নিতেই হবে	৬
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদুর	৭
বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবানের জন্য অভাববোধ	৮
ভারতে স্বামিজী আমেরিকার থেকে ফেরৎ কালে মাদ্রাজে অভিনন্দন	৯
স্বাজিমীর জীবন পথে ড়্গুধার জ্বালায় জেলে যেতে আগহী	১০
স্বামিজীর একদিন আটচলিস্নশ ঘন্টা উপবাসের পর ঝাল চাটনি ও রম্নটি খেয়ে অসুস্থ	১১
শ্রীরামকৃষ্ণের আশীবার্দেই স্বামিজীর এত সাফল্য	১২
স্বামিজীর ভারত পরিক্রমার পর ভারতের দারিদ্রতা দূর ণা করে ধর্ম প্রচার অর্থহীন বলেন	১৩
শ্রীনরেন্দ্রনাথকে শ্রী ঠাকুরের গদি করে দেওয়া	১৪
স্বামিজীর উদাহরনে আলমোরার রাজা ভুল ভাঙ্গলো	১৫
শিকাগো ধর্ম মহা সভায় (১৮৯৩ খ্রীঃ) স্বামী বিবেকানন্দ	১৬
শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মী স্ত্রোত্র	১৭
সঙ্কটনাশক শ্রী শ্রী গণেশ স্ত্রোত্র	১৮
দ্বাদশ জ্যোতি-লিঙ্গেঁর অবস্থান	১৯
শ্রী শ্রী সরস্বতী স্ত্রোত্র	২০
কৌপীনধারন-কারীরা ভাগ্যবান	২১
নারায়নকে ভয় করো না গদা আছে বলে	২২
ঈশ্বর একরূপী নহেন	২৩
হে আলস্নাহ, প্রতি সেকেন্ড তব নাম মম স্মারণে	২৪
মন অশ্রম্নজলে তব চরণ বন্দন প্রভু	২৫
করম্ননা পেতে বন্দী তোমার মম অশ্রম্নজলে	২৬
মাতৃরূপী শক্তিপূজা	২৭
বিখ্যাত হ্যানিম্যান মৃত্যু শর্য্যায় স্ত্রীর সহিত আলোচনা	২৮
স্বামী– বিবেকানন্দজী সংবেদনশীল হৃদয়ের রাজা	২৯
সাঁওতালদের সেবার মাধ্যমে স্বামিজীর সেবাধর্ম শিড়্গা দান	৩০
শ্রী পরমেশ্বর ভক্ত বৎসল	৩১
একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ থেকে হাজারো দ্বীপ জ্বালানো যায়	৩২
জননী ভুবনেশ্বরী দেবী বাল্যকালেই স্বামিজীকে যথার্থ শিড়্গাদান	৩৩
দড়্গিণ ভারতে বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক ত্যাগ রাজস্বামী	৩৪
কবিগুরম্ন বরীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ দুঃখের সময়	৩৫
দশরথ বাজার মধ্যমরানী কৈকেরীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ব্যবহার	৩৬
অলস ব্যক্তিত্ব লোকের স্থান নেই ভবে	৩৭
হিন্দুদের অজ্ঞানতা দূর না হলে ভগবৎ লাভ হবে না	৩৮
সভ্যতার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দজীর অবদান যুগান্তকারী	৩৯
স্বামিজী ও তাঁর মাতৃদেবী সীতাকুন্ড বর্তমান পঞ্চবটী স্থানে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথকে প্রণাম	৪০
লোভ লালসা ছাড়লে পায় প্রভুর কৃপা	৪১
মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে মন না দিলে কল্যান নেই	৪২
কর্মকরে খাওয়া প্রত্যেকের উচিত	৪৩

কবি শ্রী রজনীকান্তের শরণাগতি ৪৪
শ্রমহীন জীবনকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃনা করতে শেখায় ৪৫
বাঁকুড়ার কোয়াল পাড়ার কৃষ্ণ ভক্ত হয়েও প্রত্যহ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যেতেন ৪৬
শ্রী রামকৃষ্ণ বলেন শুদ্ধ ভক্তের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী ৪৭
তন্ত্রে ব্রহ্ম শক্তিকে মাতৃরূপে আরাধনার বিধান আছে ৪৮
স্বামী বিবেকানন্দজীর 'বহু' ও 'এক' সত্যের প্রকাশ ৪৯
এক হাতে সংসার করা অন্য হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে রাখতে হবে ৫০
অবতারকে বিচার করতে করতে তাঁর কৃপা হলে বুঝা সম্ভব ৫১
ভববান বুদ্ধদেব এক এক ব্রাহ্মনের দর্প চূর্ণ ৫২
প্রকৃত ভক্ত ও শ্রীভগবানের কান্ড ৫৩
স্বামিজী-আধখানা কলা শ্রীঠাকুর পূজায় দিয়ে শশী মহারাজের ঘুষি খেলেন ৫৪
ভক্তের নামে রন্নচি হলে, বাঁচার পথ হোল ৫৫
ভগবান সর্বত্র সর্বজীবের ভিতরে থেকে সবই দেখেন ৫৬
স্বামিজীর শিকাগো ভাষনে আমেরিকার কিছু শিক্ষিত লোক ভারত সম্বন্ধে উচ্চধারনা ৫৭
গৌতমবুদ্ধ কিভাবে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন ৫৮
১৮৯৩ সনে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে শেষ দিনের ভাষনে স্বামিজীর পটভূমি ৫৯
হরিতকী সংগ্রহের জন্য শ্রীগুরন্নর নিদের্শে ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করে সংসারী হয়ে ও শ্রীকৃষ্ণ লাভ ৬০
মম হৃদয়ে বসে রয়েছ তুমি প্রভূ ৬১
সর্বদা করি স্মরন উদ্ধারিও মোরে ৬২
বিধি যা কপালে লিখে ৬৩
গুরন্ন নামে এক আজব বস্তু রয়েছেন ভবে ৬৪
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জানাই শ্রীপ্রভুকে ধন্যবাদ ৬৫
শ্রীকৃষ্ণের দরিদ্র ও ভিক্ষুকের প্রতি হৃদ্যতা ছিল অসাধারণ ৬৬
হে দয়াল প্রভু, বিচার চাই ৬৭
সনাতন ধর্মে পূজাপার্বনের প্রথা জানলে প্রয়োজনে আসবে ৬৮
তারকব্রহ্ম নাম চার যুগের ৬৯
মৎস্য অবতার ৭০
কুর্ম অবতার ৭১
বরাহ অবতার ৭২
নৃসিংহ অবতার ৭৩
বামন অবতার ৭৪
পরশুরাম অবতার ৭৫
রাম অবতার ৭৬
শ্রীকৃষ্ণ অবতার ৭৭
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ৭৮
কল্কি অবতার ৭৯
গরীবের প্রতি দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৮০
গুর ধরা হল না আমার ৮১
শ্রী প্রভুর চরণ ভিক্ষার তরে আমি কাঙ্গাল ৮২

কালো শরীর আলো (১)

শ্রী অনিল মোহন কর

ও কালো শরীরে, তুই এত আলো

শশী পেলি কোথারে ও কালো শশীরে।

তুই থাকিস বৃন্দাবনে শুনেছি আমি

সারারাত জাগিসরে তুই রাধাসনে মিলে।

রাত না পোহাতে কিসে এসে যাস

আবার যথা স্থানে, একি তোর লীলারে।

তুই নিধুবনে গভীর রাতে আসলে পরে

গেইটের দরজা খুলে যায় আপনা আপনিরে।

এক দিকে কালো শেষ নেই তোর

অন্য দিকে শশী দিয়ে করিস আলোরে।

এ মহিমা বুঝবে কে রে যদি তুই

না বুঝায়ে দেস তুই মানুষকে আপন ভেবে।

ও কালো শশীরে, তুই এত আলো

পেলি কোথারে ও কালো শশীরে।

অমৃতের সন্ধ্যান পেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া (২)

শ্রী অনিল মোহন কর

ঔষধ গেলার মতো এ রকম অভ্যাস যোগ যদি তিন চার বছর ক্রমাগত চালানো
যায় আর যদি হাজার শক্ত শুকনা আলুনী লাগুক না কেন,
তখন দেখা যাবে ধ্যান ভজন জিনিসটি কত মিষ্টি যেন অমৃতের মত বিশুদ্ধ
যাহা অত্যন্ত্ম আনন্দ-দায়ক, যেন ভারসিটির একটি চূড়ান্ত্ম পাশ পরীক্ষায়।
এ সব পাশই সব টাকা রোজগারের জন্য মানযশ হবে, সুখে-বসবাস করা
এ সব অনিশ্চিত আশায়, কিন্তু ভগবান লাভ এর চেয়ে ব্যাপারটি সোজা।
ভগবানের জন্য ভাবনা ও ভয়-ধারণা বা দুশ্চিন্ত্মার কোন অবকাশ নেই এতে
মনে রাখা উচিত, সাধনায় সিদ্ধি অনিবার্য্য এই পণ রাখা উচিত মনে।
কারণ এখন অমূল্য ধনে-ধনী হওয়া যায় যা পৃথিবীর সমস্ত্ম ধন সম্পদ সুখ
বিলাসের দ্রব্যাবি তুচ্ছ করে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতের যায় অধিকারী হওয়া।
তাই অন্য সব কিছু তুচ্ছ ভেবে ঈশ্বরকে পেতে হলে অন্য সব তুচ্ছ ভেবে একটানা
তিন চার বছর অবিরাম সাধন ভজন করতে হবে ও অমৃতের সন্ধান যাবে পাওয়া।
তবে এ পথে কোন ফাঁকি দেবার চিন্ত্মা থাকলে কিছু পাবার চিন্ত্মা বৃথা
তাই বলে পেতে হলে অমৃতের সন্ধান মনকে বশ করতে হবে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমেরিকায় ভারতীয় সুষমা দেবীর সত্য আবিস্কার (৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

যথায় স্ত্রীলোকগন যথার্থ গুন গ্রহনে সমর্থ সেখানে বিবেকানন্দের ন্যায় মহাপুরন্নষ
কখনও অনাদৃত হয়ে থাকতে পারেন না, থাকেন নর নারীগণ শিষ্যত্ব করলেন শুরন্ন তাঁর।
বহু শিষ্যের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতাকে কোহিনূর মনি বললে অনুক্তি হবে না
তখনই নিউইয়র্কে একটি বেদান্ত্ম আশ্রম হয় স্থাপিত।
বেলুড় মঠ হতে একজন অতি সুদক্ষ প্রচারক স্বামী অভেদানন্দজীকে এনে সকল দায়িত্ব
কর্মভার অর্পন করে দৃঢ়ভাবে ভিত্তি স্থাপন করতঃ ভারতে যান ফিরে।
আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে স্বামিজীর প্রভাব এত বিস্ত্মৃত ছিল যে, গৃহস্থ ও সাধারণ
প্রত্যেক পুস্ত্মাকাগারে স্বামিজীর বক্তৃতাবলী রাখা অতীব হয় প্রয়োজন।
তূলনামূলক ধর্ম শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সব বক্তৃতা পাঠ্য পুস্তকরূপে হত পড়ান
স্বামিজীর প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রও মমাদৃত হচ্ছেন দেখে বৃটিশ সামাজ্যবাদীদের গাত্রদাহ হয় শুরন্ন।
কারন বৃটিশগন জগতের সম্মুখে সদাসর্বদা ভারতীয়গণকে অশিক্ষিত হেয় ও অসভ্য জাতি
বলেই উলেস্নখ করে এসেছেন, তাই স্বামিজীর যশ এভাবে বিস্ত্মার হল না সহ্য।
তাই একদিন এক দৈনিক সংবাদ পত্রে বড় বড় হরফে স্বামিজীর বিষয়েলেখা
দেখে ভারতীয়দের ভয়ঙ্কর খারাপ হল যা ছিল বৃটিশ চক্রান্ত্ম যা তাঁদের মর্জাগত্য।
এ সময়ে সুষমা দেবী নামে এক ভারতীয় মহিলার আমেরিকানদের আলাপচরিতা ছিল
বিধায় একদিন নিউইয়র্কে এক দশতালায় এক বাড়ীতে স্বামিজী সম্বন্ধে হয় আলোচনা।
ঐ সভার এক বয়োবৃদ্ধ মহিলাকে সুষমা দেবী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারা গেল
বৃটিশরা সর্বদাই কুচক্রান্ত্মকারী জগতের সম্মুখে ভারতীয়দের তুচ্ছ দেখানো ঘটনা জগন্য কুচক্রান্ত্ম।

স্বামিজীর ১৮৯৪ খ্রীঃ আমেরিকা হতে মাদ্রাজের অভিনন্দের অভিনব স্বরণীয় জবাব (৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজীর অসাধারণ এক রচনায় অভিনন্দনের উত্তর যা লেখেন ১৮৯৪ খ্রীঃ আমেরিকা থাকাকালে তার মধ্যে এক দীর্ঘ বাক্যে দীর্ঘ একটানে ভারতের ধর্মের ইতিহাস ধারাকে উপস্থিত করেন।

হিমাচলস্থিত অরন্যানীর হৃদয়স্ত্মব্ধকারী গাম্ভীর্যের মধ্যে স্বর্ণনদীর গভীর ধ্বণিমিশ্রিত উদ্বৈত কেশরীর

অস্ত্মিভাতি-প্রিয়-রূপ বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করম্নন না কেন।

অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জ সমূহে প্রিয়া পীতম কুজনই শ্রবণ করম্নন, বারানসী ধামের মঠসমূহের সাধুদিগের গভীর ধ্যানেই যোগদান করম্নন, অথবা নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্যাম নৃত্যেই যোগদান করম্নন।

বড় গেলে তেলেঙ্গো প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্ট অদ্বৈতমতালম্বী আচায্যগণের পাদমূলেই উপবেশন করম্নন, অথবা মাধব সম্প্রদায়ের আচায্যগণের বাক্যই শ্রদ্ধাসহকারে শবণ করম্নন।

গৃহী শিকদের ওয়া গুরকি ফতে-রূপ সমরবানীই শ্রবণ করম্নন অথবা উদাসী ও নির্মলাদিগের গ্রন্থ সাহেবের উপদেশই শ্রবণ করম্নন, কবীরের সন্যাসী শিষ্যগণকে অভিবাদনই করম্নন।

অথবা সখী-সম্প্রদায়ের ভজনই শ্রবণ করম্নন রাজপুতনার সংস্কারক দাদূর অদ্ভূত গন্থাবলী বা তাহার শিষ্য রাজা সুন্দর দাসের গ্রন্থই পাঠ করম্নন, অথবা আয্যবর্ত্তের ভাঙ্গ মেথরের লাল গুরম্নর উপদেশ বিধত করম্নন।

দেখা যাবে, এই আচায্যগণ ও সম্প্রদায় সমূহই সকলই সেই ধর্মপ্রণালী অনুবর্ত্তী শ্রম্নতি যাহার প্রামাণ্যগ্রন্থ, গীতা যাহার ভগবদ্বক্ত বিনিশৃত টীকা ইত্যাদি।

শারীরিক ভাষ্য যাহার প্রণালীবন্ধ বিবৃতি আর পরমহংস পরিব্রার্জকাচায্যগণ হতে লাল শুরম্ন মেথর শিষ্যগণ পর্যন্ত্ম ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহার বিভিন্ন প্রকাশ।

পাঞ্জাব কেশরীর রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে ত্যাগের যে মহিমা প্রচারিত হয়, তাতে অতি নিম্ন শ্রেণির লোকও বেদান্ত্ম-দর্শনের শিখরে শিড়্গা পেয়েছে উচ্চতম উপদেশ।

যথোচিত গর্বের গহিত, পাঞ্জাবের কৃষক বালিকা বলে থাকে, তার চরকা পর্যন্ত্ম সোহহম সোহহম ধবনি করছে ও হৃষিকেশের জঙ্গলে অনেক অভিজাত ব্যক্তিও ত্যাগী মেথরের পদতলে বসে উপদেশ শুনতে পারে।

শ্রীরাম-কৃষ্ণের কথার ভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্যের মত লড়্গান প্রকাশ পেতে (৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের প্রকৃষ্ট প্রমান একমাত্র বৃন্দাবন লীলা এই প্রকট হয়েছে ভক্তগন জানেন
কারন তাতেই তিনি অনির্বচলায় প্রেম স্বরূপতায় মূর্ত লীলা দেখায়েছেন।

শুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমে ভগবান কত ভক্তাধীন হন ও তিনি ভক্তকে কত আপনার করতে
পারেল তাহা তাঁর বৃন্দাবন লীলাতেই সবচেয়ে বেশী করে বুঝা যায়।

যে প্রেমের ধারনা করা আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির অগম্য, যার আকর্ষনে ভক্ত গোপীরা যমুনা পুলিলে
তাঁর বংশী ধবনি শুনে লজ্জা ভয়, কুল, মান তুচ্ছ উন্মত্তের মতো হয়েছেন।

সঙ্গলাভের আশায় ছুটতো ও তাঁকে পেয়ে অহংজ্ঞান ও দেহবুদ্ধি হারায়ে তাতে তন্মময়
হয়ে যেতো, সেই লীলার পরা কাষ্ঠা তিনি ঐ লীলীয় দেখিয়েছেন জগতকে।

যা ভগবান ব্যতীত কোন মানুষের সম্ভব নহে, সেই অপূর্ব লীলার মধুর আধ্যাতিক
প্রভাব যুগ্ম যুগান্ত্মর ধরে অসংখ্য নর নারীর হৃদয়কে আকষিত করেছে।

তাঁকে ইষ্টজানে আরাধনার ভেতর দিয়ে তাদের প্রাণে শান্তিত্ম ও আনন্দ দিয়ে
এসেছে, যাহা তাদের মোড়্গোর অধিকারী করার পথকে করেছে সুগম।

সেই প্রেমের ভাবকেই আবার উজ্জীবিত করতে মহাপ্রভু চৈতন্য বহুযুগ পরে অবতার হয়ে
এসেছিলেন এবং রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কামগন্ধবর্জিত মধু লীলা করেছেন।

যাহা মহাভাবে আত্মহারা হয়ে জগতকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম বিলায় গেছেন আর
সেদিন আমরা ভগবান শ্রী-রামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই।

তিনি রাধা-কৃষ্ণের মধুর ভাবের গানে বা কথা কইতে এমন মহাভাবে
আত্মহারা হয়ে জগতকে শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রেম বিলায়ে গেছেন।

যাহা রাধা-কৃষ্ণের মধুর ভাবের সাথে এমন আত্মহারা হয়ে যেতেন যে,
তাঁর সঙ্গে শ্রীরাধার ও শ্রী চৈতন্যের মতো অষ্টসাত্বিক সমস্ত্ম লড়্গান পেত প্রকাশ।

মায়ের শাসন মেনে নিতেই হবে (৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

মার কিল থাপড় ও মিঠে,

যত পড়ে পড়ক না পিঠে।

এ ধারনা যদি থাকে ঘটে-

সাবাশ মায়ের ছেলে বটে।

মায়ের মারে ছেলে মরে না

মার ভ্রূ-কুটিতে সে ডরে না।

মা যেমন রাখে, তেমনি থাকে,

মা বইতো সে কিছু জানে না।

যখন মা যেভাবে রাখবেন,

জানবে তাই আমার মঙ্গঁলের জন্য।

তুমি বোঝ আর নাই বোঝ,

সুখ, দুঃখ সবই তাঁর পদ্ম হাতের মঙ্গল স্পর্শ।

তাঁর লীলা কে বুঝবে।

সুখে-রাখুন, দুঃখে রাখুন, সবই তাঁর আশীবার্দশ।

এ ভেবে সব ঘাড় পেতে নিলে

মায়ের আর্শীবাদে সব থেকেই উদ্ধার।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদুর (৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করলে,
ইষ্ট মন্ত্রকে অক্ষার মাত্র ভাবলে,
দেব দেবীর প্রতিমাকে বা মৃত্তিকা,
জ্ঞান করলে মানুষ নরকে যায়।
অর্থাৎ ঐ সবে ভ্রমাত্মক ও
বিপরীত বুদ্ধির জন্যে এবং শ্রদ্ধা,
বিশ্বাস হীনতাদোষে আধ্যাতিক তো,
হয়ই না, বরং মানুষকে অধোগতি পেতে হয়।
যাহা তন্ত্রে বলেছেন বলে কথিত,
এ বিশ্বাসে চললে পরে ভয় নেই, ভয়নেই,
মানবের নিজের বন্ধন নিজের
হাতে, নিজেরে মুক্তিও নিজেরই হাতে।
নিজেরা জেনে শুনে ক্ষায়ে
বন্ধনে পড়ে ডুবে মরে।
কাঠের ভেতরকার আগুন যেমন
ঘর্ষনের দ্বারা, দুধের মাখন যেমন
মন্থণের দ্বারা, তিল হতে তেল
যেমন-পেষনের দ্বারা, মাটির ভেতরকার
জল যেমন খননের দ্বারা
পাওয়া যায়, সেই রকম জীবের
হৃদয় গুহায় নিহিত তার স্বরূপ
যে পরমাত্মা, তিনিও প্রাণপন
তপস্যা ও একাগ্রতা দ্বারা
উপলব্দি হন দরকার শুধু ধৈর্য্যের।

বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবানের জন্য অভাববোধ (৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

কেই যদি দরজা বন্ধ করে ঘুমায় তার নাম ধরে ডেকে দরজায় ঘা দেয়, যেমন সে জেগে উঠে সাড়া দেয় ও দরজা খুলে দেয়।

তেমনি সরল বিশ্বাসে ও ভক্তির আবেগে ইষ্টমন্ত্র জপ ও সাধন সর্বজীবের হৃদয়কারী ইষ্ট দেবতা জাগ্রত হয়ে হৃদয় মন্দিরের দরজা খুলে ও সাধুকে দর্শন দেন।

তাই তাঁর নামের এমনি অপার মহিমা যে নাম নিলে পাপী তাপী- পাষন্ড পর্যন্ত্ম উদ্ধার হয়ে যায়, ভক্তিহীনের নামে রন্নচি হয় ও বিষযে অরন্নচি হয়।

আর ভজন সাধন করতে না পারলে অন্ত্মতঃ তাঁর নাম করে যেতে হবে তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে মনে বল হবে ও শান্ত্মি আসবে।

নাম ও নামী ভিন্ন, ভগবান ও তাঁর, নামে অভিন্ন তাঁর রূপ গুন ভাব, যেমন অসংখ্য, তাঁর নাম ও তেমনি অসংখ্য নামের শক্তি অমোঘ ও অনন্ত্ম।

যে নামে রন্নচি আসে সে নামই করা উচিত, তাতেই তিনি সাড়া দেবেন কেবল নাম জপেই অভীষ্ট পূর্ণ হবে ও তাঁকে লাভ করা যাবে।

নাম বস্তুটিই একমাত্র পরমেশ্বর, যে রকম মানের গতি হল ধর্মের প্রথম সোপান, বিষয়ে ও ভগবানের জন্য অভাব বোধ সর্বদা পোষন কর্ত্তব্য।

ভারতে স্বামিজী আমেরিকার থেকে ফেরৎ কালে মাদ্রাজে অভিনন্দন (৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

১৮৯৭ খ্রীঃ ১৫ইং জানুয়ালী স্বামিজী এসে পৌঁছলেন কলম্বের ঘাটে রোঁমার

বর্ণনায় জানা যায় যে, অগনিত মানুষের আনন্দ কোলহল উত্থিত হয়ে ছিল।

দলে দলে মাণুষ তাঁর পায়ে লুঠায়ে পড়ে, পুরোভাবে পতাকা লয়ে শোভাযাত্রা

বের হল, মন্ত্রপাঠ চলল, পথ পুষ্পে পুষ্পে ভরে গেল।

চারিদিকে গঙ্গাজল ও গোলাপ জল ছড়ানো হল, গৃহের সম্মুখে ধূপ ধুনা পুড়তে

লাগল, ধনী দরিদ্র হাজার হাজার মানুষ তাঁর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য ভরে এনেছিল।

পূর্বে এ পথেই তিনি গিয়েছিলেন ভিখারির বেশে, এ বারের পরিক্রমা বিজয়ীর বেশে

সঙ্গে অগনিত উলস্নাসিত জনতা যেন রাজার সম্মুখে ভুলুণ্ঠিত।

যেন তাঁর রথরজু ধারন করে কৃতার্থ কামান গর্জ্জন করল, দলে দলে চলল

হাতী, উট বোঁলার ভাষায় গ্রীক সাম্রাজ্যরাজের বিরম্নদ্ধে ইস্রায়েলের ধ্বনিত হল বিজয় সঙ্গীত।

নিস্বার্থ অটল একাগ্রতায় বিবেকানন্দ বজ্রের চেয়েও দৃঢ় ও নিরাসক্ত কর্মযোগী

ছিলেন বলেই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেদিন স্বদেশে অভ্যর্থনা লাভ করছিলেন।

এর আগে বা সমকালে আর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতায় সম্ভব হয়নি

যা তাঁর প্রয়ানের পরেও অনুরূপ ঘটনা এ যাবত দেখা যায়নি ভারতে।

কলম্বো, কান্ডি, অনুরাধা-পুরম জাফনা, পাম্বান, রামেশ্বর, রামনাদ, মাদুরা, চিরাপলস্নী

কুম্ভকোনম্ এমনকি একটি ছোট রেল ষ্টেশানে রেল থামানো না হলে শতশত লোকজন রেল লাইনে শুয়ে পড়ে ছিলো।

মাদ্রাজ থেকে সমুদ্র পথে কলকাতালায় ছিল বিজয় বীরের পরিক্রমা এখন হতে শতাব্দীকাল

আগে, মাদ্রাজে তাঁর জন্য সতেরটি তোড়ন তৈরী করা হয়েছিল।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় চব্বিশটী মানপত্র দেওয়া হয়েছিল, রোঁলার ভাষায় যে

শঙ্খ ধ্বনি রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে পুনঃ জাগ্রত হতে আহবান করল।

স্বাজিমীর জীবন পথে ক্ষুধার জ্বালায় জেলে যেতে আগ্রহী (১০)

শ্রী অনিল মোহন ধর

স্বাজিমী ভোরে ঘুম থেকে উঠে গ্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড বা কোন গ্রাম্য পথে
হাটতে থাকুতেন যতক্ষান, না কেউ তাঁকে ডেকে খেতে দিত।
কিংবা প্রচন্ড রোদে ক্লান্ত্ম হয়ে পথ পার্শ্বের গাছ তলায় বিশ্রাম নিতে বাধ্য হতেন,
একদিন তিনি যথারীতি হাঁটছেন এ সময় পেছন থেকে ডেকে বলছে থামতে।
পেছনে ফিরেই দেখেন ইউনির্ফম পরা দাড়ি-ওয়ালা এক অশ্বরোহী পুলিস অফিসার
হাছে ছড়ি দোলছে তার পেছনে কয়েকজন পুলিশও রয়েছে।
ভদ্রস্বরে বিবেকানন্দের পরিচয় জানতে চাইলেন, জবাবে তিনি একজন সাধু
বলেন, গর্জে উঠে পুলিস অফিসার বলল, সব সাধুই বদমাশ।
পুলিস অফিসার বলল চল আমার সনে শ্রীঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি
স্বামিজী শান্ত্ম ভাবে বলেন কত দিনের জন্য, জবাবে দু'সপ্তাহ বা একমাস হতে পারে।
স্বামিজী এগিয়ে এসে অফিসারকে নরম স্বরে বললেন ছ'মাসের জন্যে ব্যবস্থা করা
যায় না? পুলিশ অফিসার স্বামিজীর দিকে তাকায়ে সন্দেহের ছাপ দেখল।
জেলে তুমি এতদিন কেন থাকতে চাও স্বামিজী ফিস ফিস করে বলেন জেলের জীবন
এর চেয়ে অনেকভাল, সকাল থেকে পরিশ্রম করে কান্ত্মি-কর কিছুই নয়।
রোজ খাবার জোটে না, প্রায়ই উপোস করে কাটতে হয়, জেলে পেট ভরে
দুবেলা খেতে পারব, আপনি আমাকে যত বেশী দিন পারেন জেলে রেখেদিন।
এসব দেখে শুনে অফিসার নৈরাশ্য ও বিরক্তি ভরে উঠে জবাবে হঠাৎ
বলেন, যাও তুমি চলে যাও বলে পুলিস অফিসারের আদেশ দেন।

স্বামিজীর একদিন আটচলিস্নশ ঘন্টা উপবাসের পর ঝাল চাটনি ও রম্নটি খেয়ে অসুস্থ (১১)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজীর একদিনের অতিশয় দুঃখের কথা জানা যায় সেটা হল তিনি একবার স্থির করেছিলেন সারাদিন হাঁটবেন, পেছনে তাকাবেন না, করবেন না ভিক্ষা।

যতক্ষান কেউ এগিয়ে এসে কথা বলে বা অযাচিতভাবে খেতে দেয় ততক্ষান তিনি থামবেন না, এ সময় তাঁকে কখনও চব্বিশ ঘন্টা বা আট চলিস্নশ ঘন্টা অভুক্ত থাকতে হয়।

একদিন প্রায় সন্ধ্যার সময় তিনি এক ধনী ব্যক্তির আস্ত্মাবলের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, একজন সহিস সেই পথে দাঁড়িয়ে স্বামিজীকে খুব দুর্বল অবস্থায় দেখে।

সহিস তাঁকে নমস্কার জানায়, তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে সাধুবাবা আজ আপনার ভোজন হয়েছে কিনা? স্বামিজী উত্তরে জানান না কিছুই খাইনি।

সহিস তাঁকে আস্ত্মাবলের ভিতরে গিয়ে হাত মুখ দোয়ার জল দিল পরে তার খাবারটিই কয়েকটি রম্নটি ও অল্প জাল চাটনী খেতে দিল।

স্বামিজী সহিসের দেওয়া রম্নটি ও ঝাল চাটনি খেয়ে পরেই তিনি পেটে এক অসহ্য যন্ত্রনায় মাটিতে পড়ে চটপট করতে শুরম্ন করলেন।

সহিস মাথা চাপড়ে কেঁদে উঠল ও বলল আমি সাধু হত্যা করলাম আসলে খালি পেটে ঝাল খেলে পেটে ব্যথা হয়, ঠিক সে সময় ঝুড়ি নিয়ে একটি লোক যাচ্ছিল।

সহিসের কান্না শুনে লোকটি দাঁড়িয়ে গেল স্বামিজী ঝুড়িতে কি জানতে চাইলে ঝুড়িওয়ালা বলল তেতুল, তখন গুলে খেয়ে যন্ত্রনা কমলে আবার শুরম্ন হাটা।

শ্রীরামকৃষ্ণের আশীবার্দেই স্বামিজীর এত সাফল্য (১২)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী জীবন ও বানীর প্রতিক্রিয়া সাধারণ আনবিক বোমা বা পারমানিক বোমার চেয়ে লড়্গগুন বেশী শক্তিশালী এবং সেই বোমা সত্যই বিস্ফোরিত হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে।

কিন্ এর প্রস্তুতি পর্ব চলাছিল তার অনেক আগে থেকেই আমেরিকার মানুষ জেনে ছিল যে একটি বোমা ফেটে পড়েছে, যে বোমা ধ্বংস করে না।

যে বোমা ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে রড়্গার পথ বাতলে দেয় হিরোসিমা ও নাগাসিকাতে। বা পরবর্তীকালে অন্যত্র যে- বোমা পড়েছে তাদেরও প্রস্তুতি শুরম্ন হয়েছিল বহু পূর্বে।

বহু বিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষনার ফল শ্রম্নতি কোন মর্মান্তিক পরিনতি এনেছিল আমরা জানি তা, কিন্তু স্বামিজী-রূপী যে বোমা পৃথিবীর মানুষকে কৌশল দখল করেছিল বাঁচার।

যার প্রস্তুতি চলছিল কয়েকটি স্ত্মরে কয়েকটি পর্য্যায়ে এবং সেই পর্য্যায়ের চূড়ান্ত্ম রূপ আমরা দেখি-পরিব্রাজক স্বামিজীর জীবনে কিভাবে ঐ শক্তি অর্জন করেছেন।

কিভাবে তার প্রয়োগ ঘটেছিল ভারতীয় জীবন ও মণনের সর্বস্ত্মরে বিশেস্নষনের প্রয়োজন রয়েছে আর এ বিশেস্নষনের সহায়তা দেবে ভগ্নি নিবেদিতার কথা, স্বামিজীর গুরম্নভাই ও জীবনী গুচ্ছ ও বক্তব্য স্বামিজীর প্রকৃত পড়্গো শারামকৃষ্ণই নরেন্দ্র নাথের চোখ খুলে দিয়েছেন দৃষ্টি শক্তি যথাযথ ব্যবহারের দায়িত্ব ছিল। নরেন্দনাথের নিজের, যাহা তাঁর পরিব্রাজক জীবনেই অন্ত্মদৃষ্টি, দূর দৃষ্টি দিব্য দৃষ্টি হয়েছিল লাভ।

স্বামিজীর পড়া শুনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আর মর্ম উপলদ্ধি গ্রহণ করার ড়্গামতা অবিশ্বাস্য স্বাজিমীর এ জ্ঞানের ভান্ডার একমাত্র তার শ্রীগুরম্ন রামকৃষ্ণের আর্শীবাদে এ ধরায় দেবপুরম্নষত্বের প্রয়াস পেয়ে ছিল।

স্বামিজীর ভারত পরিক্রমার পর ভারতের দারিদ্রতা দূর না করে ধর্ম প্রচার অর্থহীন বলেন (১৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বাজিমী বুঝে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী খালি পেটে ধর্ম হয় না, কী মর্মান্তিক সত্য

এ অনুভূতি স্বামিজার জীবনে ইস্পাতের ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অড়্গারে অড়্গারে মিলে গিয়েছিল পরিব্রজায় বের হয়ে মানুষের

দারিদ্র, যাতনা ও বেদনা দেখে স্বামিজী বুঝে-ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই সত্য।

ছোট-বড়, পবিত্র- অপবিত্র তথা কথিত পতিত পতিতা সকল মানুষের মধ্যেই

তিনি সেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করেছিলেন স্বামিজী মহারাজ।

এ শিড়্গা পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তেমন প্রত্যড়্গভাবে শিড়্গা পেয়েছেন অতি

সাধারণ মানুষের কথায় ও জীবনে যা স্বামিজী হৃদয় দিয়ে করেছিলেন অনুভব।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল আপাত ঘোর পাপীর মধ্যে ও লুপ্ত দেবত্বভাব

রয়েছে, মানুষের মধ্যে ঐ দেবত্বের বিকাশটি হলো ধর্ম ও শিড়্গার মূল উদ্দেশ্য।

পরিব্রাজক জীবনের পরি-সমাপ্তির পর শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগদিতে যাবার

পূর্বে স্বামিজীর হৃদয় আর্তমানবের সেবা ও দুঃখ দারিদ্র মোচনের উদ্বেলিত হয়েছিল।

যাতে নিজের মুক্তি অপেড়্গা জনগনের মুক্তি ও উজ্জীবনের জন্য সর্বশক্তি

দিয়ে

ঝাপিয়ে পড়তে কতখানি ব্যাকুল হয়েছিল তাহা প্রত্যড়্গদর্শী স্বামী তুরীয়ানন্দজীর স্মৃতি-চারণে।

আমেরিকা যাবার যাবার অল্প কিছুদিন পূর্বে আবু ষ্টেশানে আকস্মিকভাবে সাড়্গাৎ হয়

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে, তখন স্বামিজী ভারত পরিক্রমা বর্ণনা করেন।

ভারতের মানুষের অসীম দুঃখ দারিদ্র ও বেদনা প্রত্যড়্গ করার বর্ণনা দিয়ে তিনি অশ্রুন্ন সংবরণ

করতে পারছেন না, তখন তাঁও স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে আগে দারিদ্রতা দুর না করে ধর্ম প্রচার অর্থহীন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথকে শ্রী ঠাকুরের গদি করে দেওয়া (১৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

কাশীপুর উদ্দানবাটিতে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন তার লৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তির
বিলম্ব নেই, তাই সেই সময় নানা বিষয়ে নরেনের আলোচনা হতো।
শ্রীঠাকুর চাইতেন নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাণীবাহক রূপে মানব সমাজে উপস্থিত হোক
সাদা সাদা লোক-এদেশেও বৈদাপ্তিক চিন্ত্মাধারা প্রচারিত হোক।
অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের এমন ইচ্ছাছিল কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাঁর অক্ষমতা জানতেন
এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে চলত সংঘাত, পরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মানেন নরেন্দ্রনাথ,
২০ শে মার্চ ১৮৮৬ সাল যাত্রার দিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে অনুনয় করে বলেন
তুই যে-জন্য কাদছিস, তোকে তাই দেব, তুই আমার জন্য খাট।
তোর জন্য আমি এত দুঃখ করলুম তুই এদের জন্য একটু দুঃখ কর
আমি ষোল আনা খেটেছি, তুই এক আনা খাট, তোকে গদি করে দেব।
এই কথা-গুলির মমার্থ ১১ ফেব্রম্নয়ারী (১৮৮৬) ঘটনার কথা স্মরন করা যায়
সেদিন শ্রীঠাকুরের রোগের চরম অবস্থা, গলা থেকে রক্ত পুঁজ ঝরছে।
গলায় বাঁধা হয়েছে গাদা পাতারপলটিশ, সে অবস্থায় একখন্ড কাগজ চেয়ে নিয়ে লিখেন
"জয় রাধে প্রেমময়া নরেন শিড়্গো দিবে, যখন ঘুরে বাইরে হাঁক দেবে জয় রাধে"
অনেকেই শ্রী-রামকৃষ্ণের নির্দেশনামা এটিকে মনে করেন, কিন্তু কথাগুলির মধ্যে এমন
এমন একটা জয়োলস্নাস আছে, যাতে একে সাধারণ নির্দ্দেশ-নামা কারন হয়ে দাঁড়ায়।
দারম্নন রোগ যন্ত্রনার মধ্যেও তাঁর আনন্দে উদ্বেল সুখ সহজেই সবার চোখে
পড়ে, মনে হয়, নরেন্দ্র-নাথের স্বীকৃতিই ছিল এই ঘটনার পট ভুমিকা।

স্বামিজীর উদাহরনে আলমোরার রাজা ভুল ভাঙ্গলো (১৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী দিলস্নী থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লেন, এ সময়ে তিনি অনুভব করেছিলেন
এক অদৃশ্য শক্তি ক্রমাগত তাঁকে নিঃসঙ্গ পরিক্রমার পথে ছালাচ্ছে।
কে যেন তাঁকে আদেশ করে চলছে এই কর স্বামিজী সে আদেশ নতমস্ত্মকে পালন
করে চলছেন এভাবে চলতে চলতে স্বামিজীর পরবর্তী পরিক্রমা রানা প্রতাপের জন্ম-ভূমি।
তখন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রম্নয়ারী মাস স্বামিজী প্রথমে আলমোরার বাঙ্গালী ডাক্তার
শা গুরম্ন চরনের লস্করের ব্যবস্থায় বাজারে একটি দ্বিতল বাড়ীতে পান আশ্রয়।
রোজই সেখানে আলোচনা সভা বসত হিন্দু মোসলমান সম্প্রদায়ের বন্ধু ব্যক্তি
সে আলোচনার অংশ নিত, উপনিষদ, পুরাণ, কোরান বাইবেল থেকে হতো আলোচনা।
সেথায় বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর ও রামকৃষ্ণ প্রভূতি অবতার
ও মহাপুরম্নষের জীবন ও ভাবের ব্যাখ্যা করতেন স্বামিজী মহারাজ।
ক্রমে স্বামিজীর শুনাবলীর কথা পৌঁছে গেল আলোয়ার রাজের দেওয়ান মেঝর রামচন্দ্রজার কাছে
রামচন্দ্রজী স্বামিজীর সঙ্গে আলাপে বুঝে গেলেন স্বামিজী উচ্চ কোটির মহাত্যাগী।
দেওয়ানজী তখন স্বামিজীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন ও ভাবলেন স্বামিজীই পারবেন রাজ কার্য্যে
অমনোযোগী রাজা মঙ্গল সিংহ এর মতিগতি পরিবর্তন করতে রাজাকে।
এ সংবাদ পেয়ে রাজা দেওয়ানজীর বাড়ীতে উপস্থিত, অবশ্য রাজা ছিলেন মূতিপূজার
বিরোধী- তাই স্বামিজীর সহিত আলাপের পরই মূর্তিপূজা সম্বন্ধে স্বামিজীর হল আলাপ।
স্বামিজী হঠাৎ উপরে নজর করে দেখেন মহারাজের ছবি টাঙ্গানো, তা নামাতে বলেন
তখন সবাই ছবির উপর থুথু দিতে বলেস্নন, সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে মুখ ফিরায়ে রইল
তখনই মহারাজকে স্বামিজী বলেন ছবিটি আপনার হলেও ছবিতে তো আপনি নেই
তবুও এ ছবি সম শ্রদ্ধা বহন করে রাজার, তাই ছবির প্রতি শ্রদ্ধার মূল সম্মান।

শিকাগো ধর্ম মহা সভায় (১৮৯৩ খ্রীঃ) স্বামী বিবেকানন্দ (১৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

শিকাগোর ঘন আবহাওয়া মধ্যে জলন্ত্ম ভারতীয় সূয্য সিংহতূল্য গ্রীবা ও মস্ত্মক

অন্ত্মবেদী দৃষ্টি, সন্ন্যাসী তাঁর পরিচয়, কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি।

দেশ ত্ত জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায় ভারতের বানী

বহন করে তিনি শিকাগোতে এনেছেন স্বামী বিকোনন্দজী।

তাঁর সর্বশেষ ভাষনে নিজের চোখে দেখা এই বিশ্বসমাজকে অশোকের

বৌদ্ধ সঙ্গীতি এবং আকবরের জবাব সঙ্গে তলনা করে ঐতিহ্যবাহিক প্রয়োজনীতা করেছিলেন ব্যক্ত।

এই ধর্ম মহাসভার সংবিধানই হিন্দু ধর্মের সর্ব ধর্মসমন্বয়ী ভাব প্রচারের এক অসাধারণ

পট ভূমি রচনা করেছিলেন, যাহা পৃথিবীর সর্বাপেড়্গা গঠিত ও স্বতন্ত্র ধর্মগুলির সমতায়।

যাতে পরিস্পারিক শ্রদ্ধা ও সৌজন্য পূর্ণ এক সহজ গণত্রান্ত্মিক ভিত্তিতে মিলিত হয়েছিল

তাঁরা আর কখনও এমন বিশাল সম্মেলন এ জাতীয় অগ্নি পরীড়্গার সম্মুখীন হতে চাইবেন না।

বহুকাল ধরে শিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশনে ইতিহাসে একক স্থান অধিকারী

করে রাখবে এ অবস্থায় হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্যের সম্মুখে সর্ব প্রথম নিজমত করে ছিলেন ব্যক্ত।

স্বামিজীর বর্ক্তৃতার মর্মকথার উপস্থিত সকল বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও শ্রোতাগন

এই স্বীয় বাম্মিতা ও ইংরেজী ভাষার অপূর্ব অধিকারের মাধ্যমে শ্রোতৃবর্গকে করেছিলেন পরিতৃপ্ত।

শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মী স্তোত্র (১৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

ইন্দ্র বলেন- শ্রী পীঠে অবস্থিত ও দেবগণের পূজ্য হে মহামায়া তোমাকে নমস্কার

হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণকারী হে মহালক্ষ্মী,-তোমাকে প্রনাম।

গরুড়ে আসীণ হয়ে কোলা সুরকে ভীত সন্ত্রস্তকারিনী এবং সকল পাপ হরনকারিনী-হে ভগবতী মহালক্ষ্মী

তোমাকে প্রণাম, সর্ববিষয় অবস্থিতা, সকলের বরদায়িনী, সকল দুষ্টকে ভয় প্রদায়নী।

সকলের দুঃখ পূরণকারিনী, হে দেবী-মহা-লক্ষ্মী তোমাকে নমস্কার, সিদ্ধি, বুদ্ধি, ভোগ

মোক্ষ প্রদানকারিনী, হে মন্ত্রপূজা ভগবতী মহালক্ষ্মী, তোমাকে সর্বদা প্রণাম।

হে দেবী, হে অনাদি অনন্ত আদি শক্তি, হে মহেশ্বরী হে যোগ মাধবে প্রকটিতা ভগবতী মহালক্ষ্মী

তোমাকে নমস্কার, হে দেবী তুমি স্থূল সূক্ষ্ম এবং মহা রৌদ্র রূপিনী মহাশক্তি মহোদয়া।

এবং মহাপাপ সমূহের বিনাশকারিনা, হে দেবী মহালক্ষ্মী, তোমাকে নমস্কার, হে কমলাসনে

বিরাজমানা পরব্রহ্মরূপিনী দেবী, হে পরমেশ্বরী, হে জগদম্বে, হে মহালক্ষ্মী।

তোমাকে আমার প্রণাম, হে দেবী- তুমি স্বেতবস্ত্র-ধারিনী ও নানা অলংকার ভূষিতা,

সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্তা এবং অখিললোকের জন্মদাত্রী, হে মহালক্ষ্মী।

তোমাকে প্রণাম, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে মহালক্ষ্মীর স্তোত্রপাঠ করেন, তিনি সকল

রাজ বৈভব প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন, যিনি প্রতিদিন একই সময়ে পাঠ করেন।

তার মহাপাপ ও নাশ করেন, যিনি প্রতি দিনে দুবার পাঠ করেন তিনি ধন্য-ধান্য

সম্পন্নহন, যিনি প্রতিদিন তিনবার পাঠ করেন তার মহা শত্রু নাশ হয়।

তাঁর উপর কল্যান-কারিনী বর-দায়িনী মহালক্ষ্মী সর্বদা প্রসন্ন থাকেন

এ মহালক্ষ্মী মহাস্তোত্র যিনি ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধাভরে পাঠ করেন অহরহ অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

সঙ্কটনাশক শ্রী শ্রী গণেশ স্তোত্র (১৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রী নারদ বলেন- পার্বতী পূত্র দেবাদিদেব শ্রী গণেশকে মাথা নত করে প্রমাণ করও তার পর আয়ু কামনা এবং অর্থের সিদ্ধির জন্য সেই উক্ত নিবাসকে প্রতিদিন স্মরন কর।

প্রথমে বাঁকা মুখ বিশিষ্ট, একদন্ত্ম বিশিষ্ট তৃতীয় কালো পিঙ্গল অড়্গি বিশিষ্ট চতুর্থ হাতীর ন্যায় বদন, পঞ্চম বৃহৎ পেটে বিশিষ্ট, ষষ্ট ভীষন দর্শন।

সপ্তম বিঘ্ন নাশকারী রাজা-ধিরাজ এবং অষ্টম ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট, নবম যাঁর ললাটে চন্দ্র সুশোভিত, দশম বিনায়ক, একাদশ গণপতি এবং দ্বাদশ গজানন।

যে ব্যক্তি এই দ্বাদশ ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করেন হে প্রভু, তার কোনো প্রকার বিঘ্নের ভয় থাকে না, এই প্রকার স্মরণ করলে সর্ব প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়।

এর দ্বারা বিদ্যাবিলাষী বিদ্যা, ধনভিলাষী ধন, পুত্রাকাঙ্খী পুত্র এবং মুমূড়্গু ব্যক্তি মোড়্গগতি লাভ করেন, এই গণপতিস্তোত্র জপ করলে ছয় মাসের মধ্যে অভিলাষিত ফল প্রাপ্তি ঘটে।

এক বছরে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি লিখে আটজন ব্রাহ্মনকে সমর্পন করেন শ্রী গণেশের কৃপায় তাঁর সর্বপ্রকার বিদ্যা লাভ হয়।

দ্বাদশ জ্যোতি-লিঙ্গের অবস্থান (১৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রী সোমনাথ কাটিয়াগড় প্রদেশের অন্তর্গত বিরাজিত প্রভাস ক্ষেত্র, এই পর্বত মাদ্রাজের প্রান্তে কৃষ্ণা জেলার কৃষ্ণানদীর ধারে অবস্থিত একে দক্ষিনের কৈলাশ বলা হয়

শ্রী মহাকালে-শ্বর মালওরা প্রদেশের শিপ্রা নদীর ধারে উজ্জয়িনী নগরে বিরাজিতা ও উজ্জয়ি নদীকে অবন্তিকাপুরীও বলা হয়, মালওয়ার প্রান্তে নর্মদা নদীর তীরে ওঙ্কারের অবস্থান।

উজ্জয়িনী থেকে খান্ডোয়া যাবার রেল লাইনের মোরটক্কা নামক ষ্টেশন থেকে ছয় মাইল দূরে। এখানে ওঙ্কারেশ্বর এবং অমলেশ্বর দুটি পৃথক পৃথক লিঙ্গ হলেও এটি একলিঙ্গেরই দুরূপ।

অন্ধপ্রদেশে হায়দ্রাবাদের আগে পরগুনী নামক জংশন থেকে পারলী পর্যন্ত এক ব্রাঞ্চ লাইন গেছে, এই পারলী ষ্টেশানের কিছু দূরে পারলী ষ্টেশান।

সেখানে শ্রী বৈদ্যনাথ নামে শিবলিঙ্গই আছে সেই অনুযায়ী সাঁওতাল পরগনার ই. আই. রেলের জসিডি ষ্টেশনের কাছে বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ রয়েছে।

এই শিবলিঙ্গই প্রকৃত বৈদ্যনাথ জ্যোতিলিঙ্গ নামে সিদ্ধ হয়, কারণ এটিই চিতা ভুমি

শ্রী ভীমশঙ্কর হচ্ছে বোম্বাইয়ের পূর্বে ও পুনানদীর উত্তরে ভীমানদীর তীরে সহস্রদি পর্বতের উপর।

এ স্থান মোটর পথে নাসিকের থেকে প্রায় একশত বিশ মাইল দূরে অবস্থিত, সহ্যাদি পর্বতের এক শিখরের নাম ডাকিনী, তথায় ভূতপ্রেত ডাকিনীদের নিবাস স্থান ।

শিব পুরানের এক আখ্যানে ভীম শঙ্কর জ্যোতিলিঙ্গ আসামের কামরূপ জেলায়

এ বি রেলওয়েতে গৌহাটীর কাছে ব্রহ্মপুর পাহাড় অবস্থিত যাহা নৈনীতাল জেলার উজ্জনক নাম।

তথায় এক বিশাল শিব মন্দির আছে সেখানেই শ্রী ভীম শঙ্খর অবস্থিত

শ্রী রামেশ্বর তীর্থ প্রসিদ্ধ এটি তামিল-নাড়তে রামনাদ জেলায় অবস্থিত।

এটি বরোদারাজ্যের অন্তর্গত গোমতী দ্বারকার ঈশান কোণে বারো তেরো মাইল দুরে অবস্থিত

কেউ কেউ নিজাম হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত ঔরাগ্রামে অবস্থিত শিবলিঙ্গই নাগেশ্বর জ্যোতি লিঙ্গ বলে।

কেউ কেউ বলেন আলমোড়ার সতেরো মাইল উত্তর পূর্বে জাগেশ্বর শিব লিঙ্গই নাগেশ শিব লিঙ্গ

কাশীর শ্রী বিশ্বনাথ সুপ্রসিদ্ধ, এই জ্যোতিলিঙ্গ মহারাষ্ট্রের প্রান্তে নামিক জেলায় অবস্থিত।

যাহা আঠার মাইল দূরে ব্রহ্ম গিরির কাছে গোদাবরীর তীরে স্থিত যথায় শূর্পণখা নাসিকা হারায়েছেন।

শ্রী কেদার নাথ-হিমালয়ে কেদার শৃঙ্গে অবস্থিত, শিখড়ের পূর্ব দিকে অলকানদী।

উহার তীরে শ্রী বদরীনাথ অবস্থিত ও পশ্চিমে মন্দাকিনীর তীরে আছেন শ্রীকেদার নাথ

এ স্থান হরিদ্বার থেকে ১৫০ মাইল ও হৃষীকেশ থেকে ১৩২ দূরে অবস্থিত।

শ্রীঘুশৃনেশ্বরকে ঘৃষ্ণেশ্বর ও বলা হয় এটি দৌলতাবাদ ষ্টেশান থেকে বারো মাইল বেরম্নল গ্রামের কাছে অবস্থিত, যাহা দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অবস্থান।

শ্রী শ্রী সরস্বতী স্তোত্র (২০)

শ্রী অনিল মোহন কর

যিনি কুন্দকুল চন্দ্র এবং বরকের ন্যায় শ্বেতবর্ণা, যিনি শুভ্রবস্ত্র পরিধান করেন
যাঁর হস্ত্ম বীনায় উত্তম সুশোভিত, যিনি শ্বেত কমলা-সনে উপবেশন করেন ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্ববাদি দেবগন যাঁর সর্বদা স্ত্মতি করেন এবং যিনি সর্বপ্রকার জড়তা
হরণ করেন, সেই ভগবতী সরস্বতী আমাকে পালন করম্নন।
হে কমলাসনা সুন্দরী সরস্বতী, তুমি সর্বদিকে পূঞ্জীভূত তব দেহের আভারক্ষার সমুদ্রকে
সেবক পতিপন্ন করও মৃদুহাস্যে শরৎ ঋতুর চাঁদকেও পরাজিত কর।
তোমাকে আমি প্রণাম করি, শরতে প্রস্কুটিত, কমলের ন্যায় মুখ সম্পন্না সর্বদাত্রী অর্থাৎ
সকলের মনোবাসনা পূর্নকারিনী, শারদা সকল ঐশ্বর্য্য সহকারে মুখরূপ আসনে যেন নিবাস করেন।
বাক্যের অধিষ্টাত্রী দেবী সরস্বতীকে পণাম করি, যার কৃপায় মানুষেরা দেবতা হয়ে
উঠতে পারে, বুদ্ধিরূপী সোনা পরীড়্গার জন্য কষ্টিপাথররূপী দেবী সরস্বতী।
তাঁর বাক্যের সাহায্যেই বিদ্বানও মূখের পরীড়্গা করেন ও আমাদের পালন করে থাকুন
যিনি স্বেতবর্ণা, ব্রড়্গাবিচারের পরমতত্ত্ব যিনি সমস্ত্মজগতে ব্যপ্ত।
হস্ত্মে বীনা ও পুস্ত্মক ধারণ করে আছেন, অভয় দান করেন, মুখতারূপ অন্ধকার
দূর করেন, হাতে স্ফটিক মালা ধারন করেছেন, কমলাসনা ও বুদ্ধিদায়িনী।
সেই আদ্যা পরমেশ্বরী ভগবতী সরস্বতীর বন্দনা করি, হে বীনা ধারনকারী অপার মঙ্গলকারিনী
ভক্তের দুঃখহরনকারিনী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কর্ত্তৃক বন্দিতা,কীর্তি ও মনোরথ প্রদায়ণী।
পূজ্যবর ও বিদ্যা-দায়িনী দেবী সরস্বতা তোমায় নিত্য প্রণাম করি, শ্বেত কমল পূর্ণ
নির্মল আসনে বিরাজমানা হে দেবী, শ্বেত বস্ত্রাবৃতাসুন্দর দেহ-ধারিনী।
প্রস্কুটিত শ্বেত পদ্মের ন্যায় মুখ সম্পন্না এবং বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী, তোমায়
নিত্য প্রমাণ করি, হে মাতঃ যে ব্যক্তিগণ তোমার চরণ কমলে ভক্তি রেখে ভজনো করে,
তাহারা পৃথিবী, অগ্নি বায়ু, আকাশ, জল এই পঞ্চতত্ত্বে নির্মিত দেহে থাকাকালিনই
দেবতা হয়ে উঠে, হে উদার বুদ্ধিসম্পন্না মা, মোহরূপ অন্ধকারিনী মম হৃদয়ে বাস করো।
তবসর্ব অঙ্গের নির্মল কান্তিদ্বারা আমার মনের অন্ধকার শীঘ্রনাশ করো, হেদেবী,
তোমার
প্রভাবেই ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব বিনাশ করেন।
হে প্রকট প্রভাবশালী মাতা যদি এই তিনজনের ওপর তোমার কৃপা না থাকতো তাহলে এরা
কিছুতেই তাঁদের নির্দিষ্ট কর্ম করতে সড়্গাম হতেন না, হে সরস্বতী।
লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা, ধৃতি এই অষ্টমুর্ত্তিরূপে তুমি আমায় রড়্গা করো
দেবী সরস্বতীকে নিত্য নমস্কার, ভদ্রকালাকে নমস্কার ও বিদ্যার স্থানগুলিকেও নমস্কার।
হে মহাভাগ্যবতী জ্ঞানস্বরূপা কমলরূপ বিশাল নয়না জ্ঞানদাত্রী দেবী সরস্বতী আমাকে
বিদ্যা দাও, আমি তোমাকে প্রমাণ করি, হে দেবী।
এ স্তোত্রে যে অড়্গার পদ এবং মাত্রায় ক্রটি হয়েছে, তার জন্য ড়্গামা করো,
হে পরমেশ্বরী তুমি প্রসন্ন হও, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রনাম।

কৌপীনধারন-কারীরা ভাগ্যবান (২১)

শ্রী অনিল মোহন কর

যাঁরা সর্বদা বেদান্তবাক্যে রমন করেন ভিক্ষান্নে যাঁরা সন্তোষ বোধ করেন

শোক রহিত, দয়াশীল এবং কৌপীনধারী তাঁরাই ভাগ্যবান।

যাঁরা বৃক্ষতলায় বাস করেন, দুহাতকেই যাঁরা ভোজন পাত্র মনে করেন

ছেঁড়া কাঁথাকে যাহা কামিনীর ন্যায় তুচ্ছ বুদ্ধিতে অবলোকনকারী,

সেই কৌপীনধারী ব্যক্তিরাই ভাগ্যবান দেহাভিমানকে দূর হতে ত্যাগ করে

আত্মাকে নিজের মধ্যে দশন করে, রাতদিন ব্রহ্মে রমনকারী কৌপীনধারীরাই ভাগ্যবান।

যাঁরা আত্মানন্দেই সন্তুষ্ট থাকেন নিজের মধ্যেই সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে শান্ত রাখেন

অন্ত-মধ্য ও বাহ্য স্মৃতি থেকে যাঁরা মুক্ত থাকেন, তারাই ভাগ্যবান।

পবিত্র পঞ্চাক্ষর জপ করতে করতে হৃদয়ে পরমেশ্বরের চিন্তা নিয়ে, ভিক্ষান্ন

ভোজন করে যাঁরা সর্বত্র বিচরন করেন, সেই কৌপীনধারীরাই ভাগ্যবান।

নারায়নকে ভয় করো না গদা আছে বলে (২২)

শ্রী অনিল মোহন কর

গদা-ধরকে বিষ্ণু জেনে যে করবে
ভজন, সেই পাবে তাঁরই চরন দর্শন।
যে না চিনবে তাঁকে, কার কি বলার
আছে তাতে সে-ই বুঝবে যখন যাবে সময়।
এত সোজা রাস্ত্মার নাগাল না পেলে
আমার আপনার করার কি আছে ভবে?
রাস্ত্মায় যখন চলি ফিরি রাস্ত্মা দেখি বলে
তাইতো চলার পথে শিখে নিতে হবে ভবে।
অন্ধকারে হাতরায়ে গুরম্ন ধরবে
দেখে শুনে, ইহাই হল ভবের খেলা জানবে।
এ খেলা না জানলে ভবে সবই
হল বৃথা, এ জীবনটা চলে যাবে অবহেলার তরে।
নারায়নকে ভয় করোনা ভাই, গদা আছে
বলে, গদাধরকে নাম দিয়েছেন তোতাপুরী রামকৃষ্ণ বলে।

ঈশ্বর একরূপা নহেন (২৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

বিভিন্ন ধর্মে যত পার্থক্য থাকুক ভগবানকে সকলেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি
লয়ের কর্তা বলেন হিন্দু, মোসলমান খ্রীষ্টান যে কোন ধর্মের একই কথা।

ঈশ্বর মানেই নিয়ন্ত্মা, এখন সেই ঈশ্বরকে দৃষ্টি ভঙ্গি অনুসারে নানাজনে
নানা রূপে দেখছে, কেই তাঁকে দ্বিভুজ, কেউ চর্তুভুজ বা দশভুজ বলছে

কেউ আবার সহস্রবাহু ও বলেছ আবার কেউ বলছে তাঁর কোনরূপ নেই
যারা রূপ নেই বলছে, তাঁরা প্রার্থনার সময় বলছে তব চরনে আমার স্থান দাও।

আমরা ভগবানের চরন চাই, স্থান পাবার জন্য একটি কিছু ধরতে হবে
অথবা বলি তিনি দয়াময়, দয়া বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তি বিশেষের মনের কোমলতা।

যদি সমস্ত্ম ব্যক্তিত্বকে মুছে ফেলি তা হলে দয়া করবেন কে? আর কাকে
দয়া করবে বাক্যেই যতই আমরা নিগুন নিরাকার ঈশ্বরকে চিন্ত্মা করার চেষ্টা করি।

ঘূরে ফিরে মনের ভিতর একটা রূপ এসে যায়, সেরূপ এলে কোন দোষ নেই
কারণ তিনিই সর্বরূপ, যখন বলি তিনি মাত্র এরূপই, তখনই ঈশ্বর বিরোধী হতে হয়।

ঈশ্বর সর্বরূপী, বহু রং বহু, বড় যার কোন নেই সীমা আবার বহু ছোট
যার সীমা আমরা মনুষ্যজাতির কল্পনার বাহিরে।

হে আলস্নাহ, প্রতি সেকেন্ড তব নাম মম স্মারণে (২৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

আমি গরীব কাঙ্গাল যাব কেমনে কাবা শরীফে,
দর্শনে উপায় নেই কোন মনে মনে প্রার্থনা বিনে।
ধনবানগন যান আনন্দে কাবা শরীফ দশর্নে
দীন আমি নেই অর্থ সামর্থ কাবা শরীফ যাব বলে।
জান তুমি কেমনে চলি ফিরি কিবা খাই
সপরিবার মিলে, সারাদিন এত খাটনির পরে।
মনটি পড়ে থাকে ভিড়্গা পাবার তরে তব
চরণ দুখানি পাবার আশে, এ ছাড়াতো নেই কিছু।
গরীব করেছ আমায়, স্ত্রী পুত্র দিয়েছ মোরে
গরীবি হালে চলছে ধেয়ে খাই না খাই ভাবে।
কপালের লিখন গরীবি হাল তাইতো
খুশী, আনন্দে চলি চিন্ত্মায় সর্বড়্গান তব ভাবে।
জন্মের পর থেকে বলছে আত্মা মম
প্রতি সেকেন্ডে তব পবিত্রনাম স্মরণে।
তাইতো ভরসা মোর স্মরণে রয়েছ মম
ভুলি নাই তোমায় ভুলব না কখনও তোমায় ডাকতে।

মন অশ্রুজলে তব চরণ বন্দন প্রভু (২৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

প্রভু তুমি এস হে মন্দিরে ভক্ত ডাকে কাতরে

এক বার এস তুমি দয়া করে, এস মন্দিরে মম।

তুমি আসবে আশায় হৃদয় পদ্মাসনে পেতে

রেখেছি আসন, এস, প্রভু দয়ার সাগর।

আমি পূজব চরণ নয়নের জলে, মুচব

মম কেশ দিয়ে তব চরন যুগল, প্রভু।

মাগব ভিক্ষা জীবনের পরিত্রান, মাগবনা সম্পদ

চাহি না পদ যুগল, চাইব শুধু শুভ দৃষ্টি তব।

জীবগণ প্রতি কর দৃষ্টিপাত, তারা ফেলে

যেন উক্তি শ্রদ্ধার নয়ন জল তব চরণে।

হে প্রভু দীনবন্ধু, দয়াল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রনমী তোমায়

মম অশ্রুজল দিয়ে করছি তব চরন বন্দন।

করম্নণা পেতে বন্দী তোমার মম অশ্রম্নজলে (২৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

হে প্রভু মম আরাধ্য ইষ্ট দেব, পেতে তব পদ্ম

যুগল, বন্দী মন প্রাণে কেঁদে কেঁদে অহোরাত্র।

তবু যুগল পেলে ধোয়াব পঞ্চ গঙ্গাজল দিয়ে।

পূজব পঞ্চোপচার দিয়ে আরও দিয়ে পঞ্চতিক্ত।

আরও দেবো পঞ্চামৃত, পঞ্চ শস্য পঞ্চামৃত, পঞ্চাচার

পঞ্চ সুগন্ধি, পঞ্চরত্ন দিয়ে পঞ্চবান।

পঞ্চাঙ্গুলী দিয়ে করব তব বর্ণিত কর্ম আরও

মম পঞ্চোন্দ্রিয় দিয়ে, আরও দেব পঞ্চভাব,

নাহি মম চতুরাশ্রম আছে কেবল মম ত্রিশক্তি

ত্রিমুর্তি রয়েছে মম ত্রিনাড়ী ও ত্রিবিষ্ণু শক্তি।

দাও মোরে পঞ্চভাব পঞ্চ আশ্রয় আরও দাও

ষড়গুন বহিত কর মোর পঞ্চম-কার দাও মোরে পঞ্চ আশ্রয়

সতেজ রাখ-মোর ত্রিনাড়ী মুক্ত কর মোর ত্রিব্যাধি

আশীষ দাও মোরে দমিতে ষড় রিপু শক্তি দাও অষ্টাঙ্গে।

দাও মোরে নবশক্তি ও অষ্ট সিদ্ধি এ অষ্টবসুতে

দাও মোরে অষ্টযোগ প্রনমী তব চরন, প্রভু।

মাতৃরূপী শক্তিপূজা (২৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

মা বাপের থেকে আপন-সব থেকে নিকটে, মায়ের কাছে চলে জোর

মাতা বুঝেন যতটা, কোন ছেলের কখন কি দরকার আর কে বুঝে?

এ সব কথা বলেছেন-শ্রী রামকৃষ্ণদেব এক অড়্গার মা শব্দটী দ্বারা আমরা

যে ভাবকে প্রকাশ করি তা অসংখ্য শব্দ রাশিতেও হয় না প্রকাশিত।

মা বাপের চেয়ে আপন, সব থেকে কাছে মায়ের কাছে জোর চলে, মা যতটা

বুঝেন , জানেন, কোন ছেলের কি দরকার পৃথিবীতে তা নেই কেউ বুঝার।

এ ভাবেই মাতার ঈশ্বর ভাবও ঈশ্বরে মাতৃভাব এসেছে মাতৃভাব আসলে শক্তিভাব

তাই পুরম্নষ অপেড়্গা নারী মুর্তিই শক্তির প্রতীক, তন্ত্রে ব্রহ্মশক্তিকে মাতৃরূপে রয়েছে আরাধনার বিধান।

শ্রবন শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, মন ও বুদ্ধির শক্তি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন শক্তি মনে

হলেও অধ্যাত্মশক্তি বাহুশক্তি বা পদার্থের শক্তি এক মহাশক্তির রূপান্তর।

সেই চিন্ময়ী শক্তিই মাতৃরূপে আরাধনা বিশ্বের সব কিছুরই জন্মদাত্রী হলো মা

(মনু-১-৩২ মতে) মনু বলছেন নারী বুদ্ধিরূপা, শক্তিরূপা, জগজ্জননী।

ভারত চিরদিনই শক্তির উপাসনা করে এসেছে শক্তিরূপিনী মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ নারীকে

তার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেবার কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার বলেছেন।

তাই তো তিনি স্বয়ং তাঁর পূর্ণ যৌবনা স্ত্রীকে মহাশক্তিরূপে পূজা করেছেন

আবাহন করেছেন বিদ্যাশক্তিকে ভারতের তথা জগতের কল্যানের জন্য।

বিখ্যাত হ্যানিম্যান মৃত্যু শর্য্যায় স্ত্রীর সহিত আলোচনা (২৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

বিখ্যাত হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক শেষ বয়সে শ্বাস কষ্টাদিতে অত্যন্ত নিদারুন কষ্ট পান দেখে তাঁর স্ত্রী বলেন যখন তুমি অপরের যাতনা কমাবার চেষ্টা করেছ, বহু দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করেছ তাই ভগবান তোমাকে বিষম কষ্টের হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য দায়ী, তখন মুমূর্ষ বৃদ্ধ অথচ গম্ভীর স্বরে বলে-ছিলেন।

ভদ্রে, আমি এরূপ ক্লেশ হতে মুক্তি পাবার আশা করব কেন, কোন বিষয়েই ভগবান আমার নিকট ঋনী নহেন, বরং আমি তার কাছে ঋনী।

এটাই হল ব্যথার পূজা, দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে ভগবানের দানকে মাথা পেতে নেওয়া, মরনাগত হয়ে তাঁর পাদপদ্ম গভীর শ্রদ্ধাভরে চিন্ত্মা করা।

তের বছর ধরে দ্রৌপদী মনে মনে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন, যুদ্ধ শেষে অশ্বত্থমার পৈচাচিক হত্যাকান্ডের ফলে তাঁর পাঁচশটী সন্ত্মানই গেল মারা।

গুরুপুত্র অশ্বত্থমাকে বন্দী করা হয়েছে কেবল হত্যার অপেক্ষায়, ব্যথার পূজার সর্বশ্রেষ্ট পূজারিনী মহামতি দ্রৌপদী স্বামীকে অনুনয় করছে, ছেড়ে দাও গুরুপুত্রকে।

ওঁর মা বেঁচে আছেন, আমি মাতৃশোক চাইনা দেখতে, তিনি ধর্মকে সেবা করেছেন ভগবানকেও করেছেন চোখের জলে পূজা, হৃদয়ের সর্বটুকু ব্যথা দিয়ে।

অহংকারই আমাদের সমাজের যত দুঃখের কারণ, শরনাগত হয়ে দুঃখে দুঃখে তাঁর দিকে জীবনের মোড় ফেরালেই দুঃখের সর্ব অবসান।

স্বামী– বিবেকানন্দজী সংবেদনশীল হৃদয়ের রাজা (২৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

বেলুড় মঠে অবস্থান কালে স্বামিজীর দুটি ঘটনা অনুমানের প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ মানব জাতির প্রতি এতই তাঁর ভালবাসা এত গভীর যে তিনি ভবিতব্য ঘটনা বুঝতেন। যার সাক্ষী তাঁর গুরম্ন ভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্বয়ং, যাহা ঘটে ছিল রাত দুটোর সময় তখন বিজ্ঞানানন্দজী জেগে উঠে দেখেন স্বামিজী শুধু পায়চারি করছেন। চিন্ত্মানীত হয়ে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামিজীর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন এতরাতি পায়চারির কারণ, উত্তরে স্বামিজী বলেন আমি ভাল ভাবেই ঘুমা-ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ জেগে উঠে যেন কোথাও একটা অনুভব করলাম, তখন ঘুম ভেঙ্গে গেল মনে হয় কোথাও একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে বহুলোক বেদনায় আর্তণাদ করছে। এটা গুনে বিজ্ঞানানন্দজী নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, পরদিন সকালে সংবাদপত্রে পিজিদ্বীপের নিকটবর্তী স্থানে আগ্নেয়গিরির উদগিরনে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা স্বামিজীর ঘর থেকে মধ্যরাত কান্নার শব্দ শুনে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামিজীর ঘরে ছুটে যান ও স্বামিজী অসুস্থ মনে করে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে যান। গিয়ে দেখেন তাঁর চোখে জল ও কাঁদছেন স্বামিজী অসময়ে বিজ্ঞানানন্দজীকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ভাই, মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিন্ত্মায় আমি ঘুমাতে পারি না। তাই শ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি সকল মানুষের কল্যান হোক সকলের দুঃখ দুর হউক, (দেব পৃষ্ঠা ৩১৪-১৫) স্বামিজী সংবেদনশীল হৃদয় মানুষের জন্য কাতরছিলেন।

সাঁওতালদের সেবার মাধ্যমে স্বামিজীর সেবাধর্ম শিক্ষা দান (৩০)

শ্রী অনিল মোহন কর

বেলুড় মঠে বাড়ির চারপাশের জমিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য গর্ত ভরাট করার জ ন্য ১৯০১ খ্রীঃ কয়েকজন সাঁওতাল শ্রমিক স্বামী অদ্বৈতানন্দ নিয়োগ দেন।

স্বামিজী এ সাঁওতালদের খুবই ভালবাসতেন তাই তাদের সঙ্গে কথা বার্তা করে সময় কাটাতেন, এজন্য তাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করলে তাঁরা তাদের দুঃখের কথা স্বামিজীকে বলত।

তাদের দুঃখের কথা শুনে স্বামিজী চোখের জলও ফেলতেন এবং তাদের কেষ্টা নামের একজন পরিনত বয়স্কের লোকের সঙ্গে কর্তাবার্তা বলে আনন্দ পেতেন।

স্বামিজী মানুষের সেবাই ঈশ্বর লাভের উপায় ভাবটি তাঁর সুযোগ্য গুরম্নভাইদের অন্ত্মরে প্রতিষ্ঠিত হউক এ উদ্দেশে সাওতালদের সেবার সুযোগটি কাজে লাগান।

তাই সাঁওতাল শ্রমিকদের জন্য একটি ভোজের ব্যবস্থা করে নিজেই দেখা শুনার ভার নেন। স্বামিজী তাদের পেটভরে খেতে দেখে খুবই খুশী হলেন।

তারা এমন সুস্বাদু খাবার কখনও আর খায়নি স্বামিজীও খুব তৃপ্তি বোধ করে-ছিলেন যাহা নিজের আনন্দ বলেই অনুভব করলেন।

খাওয়া শেষ হলে স্বামিজী বলেস্নন তোমরাই নারায়ন প্রত্যক্ষ্য দেবতা, আজ আমি সাক্ষাৎ নারায়ন সেবা করলাম যাহা আমি অত্যন্ত্ম তৃপ্ত।

স্বামিজী তাদের সরলতা এমন আন্ত্মরিক অকপট আর কোথাও দেখতে পাননি যাহা এদেশের গরীবদের জন্য কেউ কোনদিন ভাবে না।

অথচ তারাই দেশের মেরম্নদন্ড, তাদের শ্রমে দেশের অর্থ উৎপন্ন হয় দরিদ্র মেথরদের জন্য কেউ ভাবে না অথচ তারা একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরের লোকের আতঙ্ক সৃষ্টি হবে।

তাই যদি হয় তবে গেরম্নয়া পোশাক পরার কী সার্থকতা আছে এ ভারতবর্ষে অন্যের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করাই হচ্ছে যথার্থ সন্ন্যাস।

শ্রী পরমেশ্বর ভক্ত বৎসল (৩১)

শ্রী অনিল মোহন কর

একখন্ড কয়লার মধ্যে সূর্যের আলোক রশ্মি প্রবেশেই করতে পারে না, কিন্তু এক খন্ড স্ফটিকে শুধুমাত্র সূর্য কিরণ প্রবেশ করতে পারে এমন নহে।

আবার স্ফটিকগুনে সেই কিরন সহস্র বনে প্রতিকলিত হয়ে সূর্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে, তার মহান জীবনে সাত্ত্বিক গুনের বেশী হয়েছিল।

তাই অধিকাংশ মানুষ কয়লার মত যাহা প্রবাদে আছে কয়লা ধোলেও যায় না ময়লা, অর্থাৎ যার যার গুনাগুন কিছু না কিছু যায় থেকে।

সাধারণতঃ গ্রামের উৎসবাদিতে শুধ বর্ত্তৃতার স্থান নেই, প্রসাদের জন্য আছে আকতি গ্রামে উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রসাদ বিতরন ও গ্রহনই মূল আকর্ষণ।

যেহেতু অজোঁ পাড়া গাঁ শুষ্ক প্রাণহীন তত্ত্বকথায় বিশেষ কদর নেই গ্রামে অথচ প্রসাদের জন্য বহু লোকের আগমন ও ক্ষুধাত্ত শিশুদের বিরামহীন কান্না।

হঠাৎ দেখা গেল সবার অলক্ষ্যে পদ্মলাভ বাবু প্রধান উদ্দোগতা হলেন নিরন্নদ্দেশ উৎসবের প্রধান নায়কের খোঁজ নেই, সবাই মৌন, সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়।

তখন পাশের গ্রামের জমিদার বাবু চালের ভার নিলেন, স্বামী জপানন্দজী নিজে কিছু টাকা দিলেন, সমস্ত্ম গ্রামবাসীর ঘর হতে কিছু কিছু দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত হলো।

মাটির নালা কেটে গ্রাম বাসীদের প্রত্যেকের মাটির ছোট হাড়ী এনে নীচে আগুন জ্বেলে খিঁচুড়ির ব্যবস্থা হলো, সমবেত প্রচেষ্টায় সাক্ষাৎ সমবায়।

তখনও পদ্মলাভ বাবুর খোঁজ নেই স্বামী জপানন্দজী বিষন্ন হৃদয় পদ্মলাভ বাবুর মাকে জিজ্ঞাসা করেন তাদের কোন ঠাকুর ঘর আছে কিনা যাতে তিনি আহ্নিক করবেন।

পদ্মলাভ বাবুর মা তাঁদের ছোট ঠাকুর ঘরটি দেখায়ে দিলেন, কিন্তু জপানন্দ বাবু ঠাকুর ঘরটি খোলার চেষ্টা করলে দেখেন ভিতর থেকে বন্ধ।

অনেক ডাকাডাকির পর ভিতর থেকে দরজা খুলে দিলেন, পদ্মলাভ বাবু যিনি স্থির চিত্তে শ্রী-শ্রী ঠাকুর অপার করন্ননাসিন্ধু ভক্ত বৎসলকে প্রার্থনা জানা ছিলেন।

এ ছিল দুঃখের ব্যথার মাঝে আনন্দের সন্ধান, সবাইর চোখে আনন্দের জল ভূমিষ্ঠ হয়ে আত্মনিবেদন করে সকলেই আকুতির হৃদয় দিয়ে, তাই যার মন যেমন।

একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ থেকে হাজারো দ্বাপ জ্বালানো যায় (৩২)

শ্রী অনিল মোহন কর

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে মন্ত্মব্য করছিলেন

আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না, আড়ম্বর করি, কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি, বিশ্বাস করিনা,য াহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না, ভুরি পরিমান

বাক্য রচনা করতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করতে পারি না।

আমরা অহংকার দেখায়ে পরিতৃপ্ত থাকি যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না, আমরা

সকলেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ক্রটী লয়ে আকাশ বিদীন করতে থাকি।

অথচ সভ্যতার উপলগ্নে থেকেই লীলাময় ভগবানের লীলা মানুষের জীবন কেন্দ্র

করে চলছে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, শুদ্ধ ভক্তের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী।

মানব সমাজে সব দেশেই দেখা যায় কোন, কোন মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য

ও মাধুর্যের প্রকাশ, তাঁদের অন্ত্মর্লীন পবিত্রতার দিব্য মহিমা, প্রশান্ত্মিও প্রতিশ্রন্নতি।

আদর্শ জীবনের জন্য আত্মবিলয়ের আনন্দ এবং নিরলস সেবার ভাব ভগবৎ শক্তির

দু' একটি কিরন রেখা মাত্র, আভাস ইঙ্গিতে কিছু পরিমানে মানুষের মনকে স্পর্শ করে।

এঁদের পবিত্র জীবন ও স্মৃতি এঁরা মানুষের স্মৃতিকে আশ্রয় করেই তাদের কল্যান করেন

এঁদের জীবন ভাগবত ভাবনাও বিশ্বাসের যেন অচল বিগ্রহ মাত্র।

একটি প্রজ্জ্বলিত দীপই জ্বালাতে পারে অন্য দীপকে যাহাতে হাজার হাজার

দীপ জ্বালাতে পারবে, তাই একজন সত্যিকার সাত্ত্বিক মানুষকে অনুস্মরন করলেই জীবন পথের আধ্যাত্মিক রাস্ত্মা খুলে যায়।

জননী ভুবনেশ্বরী দেবী বাল্যকালেই স্বামিজীকে যথার্থ শিক্ষাদান (৩৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

ভুবনেশরী দেবী বাল্য কালেই যথার্থ শিক্ষা দান করেছেন স্বামিজী মহারাজকে যার অঘাধ শ্রদ্ধাবোধ ছিল নিজ মাতৃদেবীকে, তার জগৎ বিখ্যাত পুত্রকে মুগ্ধ করে ছিল।

ভূবনেশ্বরী দেবী ১৮৪১ খ্রীঃ শিমুলিযার বিখ্যাত বসু বংশের তাই, আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী কর্ম কুসলা ও ভক্তি-পরায়ন।

স্বামিজী তাঁর কাছ থেকে শিশুকালে রামায়ন মহাভারতের অনেক কাহিনী শুনে প্রীত হতেন এবং সংসারের যাবতীয় কর্ম-সুচারন্নরূপে সম্পাদিত করতেন।

সকল প্রাথমিক শিক্ষা ছেলে মেয়েদের তিনিই দিয়েছেন, হৃদয়বান বিশ্বনাথের উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী ছিলেন এবং নরেন্দ্রকে কোলে বসায়ে দেবদেবীর মাহাত্ম্য শুনাতেন।

একবার স্কুলে নরেণকে শিক্ষাক অযথা শাস্তিত্ম দেন, নরেন্দ্র প্রতিবাদ করলে শাস্তিত্ম আরও বেড়ে যায় জজরিত দেহে বাড়ী ফিরলে মাতাকে ঘটনাটি বিধৃত করেন।

স্নেহময়ী জননী ফল যা হোক না কেন সর্বদা যা সত্য তাই করে যাবে অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ও অপ্রাতিকর ফল সহ্য করতে হবে।

সত্যকে ছাড়বে না, জননী আরও শিক্ষাদেন আজীবন পবিত্র থাকবে, নিজের মর্যাদা রক্ষা করবে কখনও অপরের মর্য্যাদা লঙ্ঘণ করবে না।

মায়ের অশেষ সদগুন সম্পন্ন জ্যৈষ্ঠ পুত্র শত চেষ্টা করেও কোন অর্থকারী কর্মের সন্ধ্যান পাননি বলে সংসারের উপর বীতরাগ হয়ে চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করেন।

এই সেই স্বামিজী মহারাজকে নিয়ে আমরা সকলেই ভারতের অমূল্য রত্নরূপে সারাবিশ্ব সমাজে আমরা গর্বান্বিত হয়ে কথা বলতে পারি।

দড়্গিণ ভারতে বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক ত্যাগ রাজস্বামী (৩৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

বহুকাল আগে দড়্গিণ ভারতে বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক ত্যাগরাজ স্বামীকে তার পিতা রামব্রহ্মন অবিনশ্বর পিতৃধনে ধনী হয়ে উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হয়ে জন্মেন।

অসামান্য নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ত্যাগ ও ব্যক্তির মাধ্যমে প্রাণহীন শিলাকে তিনি চেতনা-নায়িত করেন শ্রীরামের ধ্যানে তাঁর প্রেমে নিজেকে নিঃশেষে ভক্তি সঙ্গীত মালার মাধ্যমে শ্রীরাম চরনে অঞ্জলি দিত।

তাঁর সুদীর্ঘ সাধন জীবনে দুইশত বিভিন্ন রাগে প্রায় চব্বিশ হাজার সঙ্গীত হয় রচিত আত্মভোলা সাধকের সঙ্গীতে কর্নাটক সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে।

পূন্যাস্রোতা কাবেরী তীরে তিরম্নবারির একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান, এতীর্থস্থানে ত্যাগরাজের মন্দির রয়েছে, শৈবসাধক অপর, সুন্দরের তিরম্ন-জ্ঞান সম্বন্ধর প্রভৃতি সঙ্গীতে মুখরিত আকাশ বাতাস।

এখানে বাস করতেন এক, নিষ্ঠাবান স্বধর্ম পরায়ন তেলেগুব্রাহ্মন পরিবার রামব্রহ্মন ও সীতাদেবী এদেরই সন্ত্মান ত্যাগরাজস্বামী, বংশের ধারা অনুসারে তিনি সঙ্গীত ও সংস্কৃত সাহিত্যে পারর্দশী ছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ন তার অত্যন্ত্ম প্রিয়গ্রন্থ ছিল, শ্রীরামের প্রতিভক্তি বিশ্বাসে পাঠ্য পুস্ত্মক ছেড়ে তিনি সঙ্গীত শিখতে আরম্ভ করেন ও বিখ্যাত সন্ত্মি ভেংকটরাম নাইয়ারের কাছে গান শেখেন।

পিতৃপ্রদত্ত শ্রীরাম বিগ্রহের নিয়মিত জপ অচ্চর্না করতে থাকেন, ফুলের সঙ্গে নিত্য নতুন ছন্দে গান গেয়ে পুষ্পাঞ্জলী দিতেন ও প্রত্যহ এক লড়্গ পঁচিশ হাজার রামনাম জপ করতেন।

এভাবে ৩৮ বৎসরে ৯৬ কোটিবার জপ সাঙ্গ করার পর সীতাও রাম লড়্গণের দর্শন পান, এভাবে ২১ বছর ২৫ দিন নিরন্ত্মর নামজপ করেন।

নামের মাধ্যমে দেবতার যশ, বীর্য ও গুন, প্রকাশিত হয়, নাম জপের মাহাত্ম্য আমাদের শাস্ত্রে নানাভাবে কীর্তিত আছে, গীতাতেও নাম জপের কথা বর্ণিত রয়েছে।

বিষ্ণু পুরানে (৬-২-১৭)বলেন ধ্যান সত্যযুগে ত্রেতায় দান, দ্বাপড়ে অর্চ্চনা আর কলিতে সংঙ্গীত কেশবম্ আরও বলেছেন মানুষের জিহবা আছে তার নিজের অধিকারে নামকীর্তন না করলে নরক বাসী হয়।

কবিগুরম্ন বরীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ দুঃখের সময় (৩৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

মহা ঐশ্বর্যের সন্ধ্যান পেলে কেউ আর সাধারণ সুখের জন্য লালায়িত হয় না

ব্যথা নিয়ে নিদারম্নন দু:খ মর্মান্তিক শোক ও হৃদয় বেদনা দিয়েও পূজা করা যায়।

কালীয় নাগ এ পূজার এক শ্রেষ্ঠ উপাশক সে নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে পেরেছিল

আমার মুখের হলাহল তো তোমারই দান, এছাড়া তো আর কিছুই আমায় দেওনি।

তাই তোমাকে এই হলাহলেই উপহার দিয়েছি দুঃখ বেদনার তো অন্ত নেই, তাই আমরা

যেন এই উপাচারেই তার পূজা শিখি তাই ভক্ত গাইছেন গান,

"যথা আমার ঘরে তোমার প্রভু সহজ সাধারণ চোখের জলে প্রানের ব্যথা"

নীরব নিবেদন সাধক করি রবীন্দ্রনাথের জীবনে শোক তাপের অন্তছিল না।

১৯০২ খ্রীঃ এ তাঁর স্ত্রাবিয়োগ, ১৯০৩ খ্রীঃ তে কন্যা রেনুকা, ১৯০৪ এ পিয় শিষ্য সতীশ

মারা যায়, ১৯০৫ এ তাঁর পিতা, ১৯০৭ এ তাঁর পুত্র সমীন্দ্রের মৃত্যু হয়।

গীতাঞ্জলী, নৈবদ্য ও খেয়ার অমর কবিতাগুলি তাঁর এই শোকতপ্ত হৃদয়ের নির্যাস

স্ত্রীকে এক পত্রে কবিতা ব্যথার পূজা কিভাবে করতে হয় তাই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বেঁচে থাকতে গেলেই মৃত্য কতবার আসবে দ্বারে এসে আঘাত হানবে তার ঠিক নেই

মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা এ বিশ্বে আর নেই, শোক ও বিপদের মুখেই এ জীবন।

তাই ঈশ্বরকে প্রকৃত বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শিখি তাহলে

শোকের অন্তনেই, তাই কবিতায় ঈশ্বরকে দৃঢ়ভাবে ধরার কথা বলেছেন,

যত বিশ্বাস ভেঙ্গে যায় স্বামী,

এ বিশ্বাস রহে যেন চিত্তে লাগিয়া,

যে অনল তাপ যখনি সহিব আমি,

দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।

দশরথ রাজার মধ্যমরানী কৈকেরীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ব্যবহার (৩৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

রামচন্দ্রকে যুবরাজকে অভিষিক্ত করবেন দশরথ, সর্ব সমড়্গো এ বার্ত্তা ঘোষিত হয়েছে বশিষ্ট প্রভৃতি জ্ঞানীবৃন্দ পুরোহিতগণ আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যস্ত্ম।

রাম সীতা পূর্ব রাত্রে বৈশিষ্ঠের উপদেশে উপবাস, এমন সময় কৈকেয়ী শ্রীরামকে সেই কঠিন আদেশ দিলেন, আশ্চর্যের বিষয় শ্রীরাম চন্দ্র অসৌজন্য করেননি প্রকাশ।

কুচক্রণাতি কৈকেয়ীকে প্রণাম করে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, রামচন্দ্র ও মানসিক দুর্বলতার উর্দ্ধে নন, কাজ্যেই স্বভাবত কখনও কখনও তার মনে কৈকেয়ীর বিরম্নদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে মনোভাব।

কৌশল্যাদেবীকে কৈকেয়ীর হাতে লাঞ্চিত হবার আশংকা করেছেন বনবাসে যাত্রাকালে বনবাসে রামচন্দ্র, লক্ষ্মন অযোধ্যায় থাকার জন্য বলেছেন, শুধু এজন্য রামায়নে ৩১ সগের ১১,১২,১৩ ও ১৭ তে স্লোক রয়েছে উলেস্নখ।

শ্রীরাম দশরথ ও কৈকেয়ী সম্বন্ধে বিরম্নদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন এমনকি কৈকেয়ী কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে বিষ খাওয়ার সম্ভবনা আছে। এসবও ভেবেছেন।

লক্ষ্মন ও ভরত যখনই কৈকেয়ীর বিরম্নদ্ধ সম্পর্কে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন, এমনকি হত্যার কথাও বলেছেন, কিন্তু ধর্মও শ্রীরামচন্দ্রের ভয়ে নিজকে শান্ত্ম রেখেছেন।

কিন্তু রামচন্দ্র এত মহৎ ও উদ্ধার যে দশরথ ও কৈকেয়ীকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলেছেন ধর্ম-শীল তারা কত উচ্চ অন্ত্মঃ করন হলে ধর্মশীল বলা যায় কৈকেয়ীকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোশ বলেছেন।

শেষকালে ভরতের অযোধ্যা যাত্রার পূর্বে আবার রামচন্দ্র ভরতকে কৈকেয়ীর প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্য বলেছেন, সীতাদেবীও নিজের এদুরূহ কর্ত্তব্যের ভার দিয়েছেন ভরতকে।

অলস ব্যক্তিত্ব লোকের স্থান নেই ভবে (৩৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

যে বসে থাকে, তার ভাগ্যও বসে থাকে যে উঠে দাঁড়ায় তাঁর ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়

যে শুয়ে পড়ে, তার ভাগ্যও পড়ে শুয়ে, যে এগিয়ে চলে, তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে।

অতএব এগিয়ে চলো, যে চলে দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের

মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে, তার আত্মাদিনে দিনে বিকাশিত হতে থাকে।

এই তো মস্ত্ম ফল, তারপর তার চলার শ্রমে চলাবার মুক্ত পথে তার পাপ গুলি

আপনিই অবসন্ন হয়ে ঝড়ে পড়ে, পাপের সমস্যার জন্য তার মাথা ঘামাতে হয়না।

অতএব, এগিয়ে চলো, চলতে চলতে যে শ্রান্ত্ম তার শ্রী-র অন্ত্ম নেই, এ কথাই

শুনেছি চিরদিন, যে চলে দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে চলেন।

যে চলতে চায়না সে শ্রেষ্ঠ হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে, পাপে লিপ্ত

থাকে, অতএব, এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো, এগিলে চলো

ঘুমিয়ে থাকাঠাই হল কলি কাল জাগলেই হল দাপড়, উঠে দাড়ালেই ত্রেতা

আর এগিয়ে চলাই হল সত্য যুগ, অতএব এগিয়ে চলো।

চলাটাতেই হলো অমৃত লাভ, চলাটাই হলো স্বাদুফল, চেয়ে দেখলে ঔই সূর্যের

আলোক সম্পদ, সে সৃষ্টির আদি থেকে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমায়ে পারেনি।

অতএব, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলার এই দীপ্ত বাণীই আমাদের আলস্য ও কার্য বিমুখ

জীবনকে ধিক্কার, কর্ম, আমাদের জীবনের নিয়ম, কর্ম না করলে কেউ তিষ্ঠিতে পারবে না।

দেবগন কর্মফলে প্রভাব সম্পন্ন হয়েছেন সমীরণ কর্মবলে সতত সঞ্চলনা করেন

পৃথিবী কর্মবলে আলস্য শূন্য হয়ে দিবারাত্র পরিভ্রমন করছেন

মহর্ষিগন ব্রহ্মবিদ্যা ও অন্যান্য ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন

আদর্শ পুরম্নষের দৃষ্টান্ত্ম আলস্য পরায়ন ও কর্মে অমনোযোগী হলো সামাজিক বিশৃঙ্খলার যথার্থই সম্ভব।

হিন্দুদের অজ্ঞানতা দূর না হলে ভগবৎ লাভ হবে না (৩৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

উপনিষদ বলছেন একমেবা দ্বিতীয় যার মধ্যে আত্ম ও প্রকৃতি একত্র বিধত-এক কথায়

যিনি অনন্ত্ম, আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ লড়্গা চূড়ান্ত্ম প্রয়াস মাত্র।

এই অড়্গায় শাশ্বতের সঙ্গে যে কোন ভাবেও যে কোন মাত্রাতে মিলিত হবার জন্য

যে, কোন উপায় আবিস্কার করা, দ্বিতীয় কথা হল মানুষ বহুবিধ উপায়ে অনস্ত্মের নাগাল পেতে পারে।

বিভিন্ন দেবদেবী সেই একই পরম দেবতার বিভিন্ন রূপ, এই পরম ব্রহ্মকে আমরা যে কোন

নামে ও যেকোন আকারে ডাকতে পারি, প্রত্যেক জীবের মধ্যে অনন্ত্ম সুপ্ত আছে।

সেই পরমকে জানার জন্য হিন্দুর সাধনা অজ্ঞান দূর হলেই জ্ঞান লাভ হয়

নারায়ন সর্বত্র কাহাকেও বিদ্বেষ বা ঘৃণা করার কোন স্থান নেই।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎ প্রভু, বিশ্বব্যাপী বাসুদেব অথচ স্বীয় মহিমা প্রচ্ছন্ন করে পিতা

পুত্র, মাতা, পতি, সখা, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি সম্বন্ধে মানব দিগের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে লীলা করেন।

তাঁর জীবনে আর্যগনের শ্রেষ্ঠ রহস্য এবং ভক্তি সার্থের উত্তম শিড়্গা নিহিত আছে

আত্মসমর্পন হোল নিজকে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ রূপে বিলিয়ে দেওয়া।

বিন্দুমাত্র অহংকার না রাখা, তার সাধনায় আত্ম সমর্পনের স্থান অত্যন্ত্ম গুরম্নত্ব পূর্ণ

এই আত্মসমর্পন ও আত্ম নিবেদনের অভাবে সাধকের অভিষ্ট লাভ হয় না।

শাস্ত্র, গুরম্ন, উৎসাহ ও কাল এ চারটির কথা তিনি বলেছেন সাধনার ব্যাপারে

উৎসহ যেমন থাকা দরকার তেমনি আত্ম সমর্পনে ভগবৎ কৃপাও চাই, নচেৎ সাধকের সিদ্ধি লাভ হয় না।

সভ্যতার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দজীর অবদান যুগান্ত্মকারী (৩৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

সভ্যতার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান যুগান্ত্মকারী অনেক খানি বৈপস্নবিক ও জ্ঞানীর সীমাকেই তিনি

বলেন মহামায়া, মায়া ব্রহ্মের শক্তি, অভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যড়্গা করেন সীমার মধ্যে অসীমকে।

নশ্বেরের মধ্যে অধিনশ্বরকে মত্যের মধ্যে অসত্যকে জীবের মধ্যে শিবকে বিশেষত পতিনারীর মধ্যে

বিশ্ব জননীকে তিনি যেন এমন আলোক বর্ত্তিতা তার প্রেমেই আমাদের আশ্রয়স্থল।

প্রেমিক এই মহাপুরন্নষ নিজের সমাধি সুখ চাননি, চেয়েছেন মানুষের ব্যথা জর্জর জীবনকে

শান্ত্মির পথ দেখাতে, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দুর্বল মানুষকে উপদেশ দিতে।

ঈশ্বরকে নিয়ে জীবন ধারন করতে, তিনি বিবেকানন্দকে আহবান জানালেন, শিড়্গা দিলেন প্রেরনা দিয়ে

লোক শিড়্গার দায়িত্ব অর্পন করলেন, স্বামিজী মানুষকে অন্ত্মনিহিত আত্মার মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের শিড়্গা দিলেন

অমর আত্মার মহিমার বানী উচ্চারণ করে দুর্বল মানুষকে নির্ভীক হবার আহবান জানান

এ সব কথা তিনি সকলের কাছে বলেন বলিষ্ট ভাষায়, আত্ম প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় ও পরম আকতিতে।

মানুষের মধ্যে অন্ত্মনিহিত দেবত্বকে সৎ চিন্ত্মা সৎ কাজ ও সত্যাশ্রয়ী জীবনের মাধ্যমে প্রকাশ

করা যায়, ঈশ্বর জীবের অন্ত্মরেও বর্হিজগতে সর্বত্র সদা বিরাজমান।

সকল প্রাচীন ধর্মই সত্য, সত্য ধর্মের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সকল

ধর্মের আচার্যগনকে শ্রদ্ধা করা উচিত, ধর্ম- বিরোধ অজ্ঞানতা প্রসূত।

এ জন্মেই মানুষ সাধনার দ্বারা ভগবানের সান্নিধ্য উপলদ্ধি করতে পারা যায়

বর্তমান জগতে শ্রীরামকৃষ্ণকে ও বিবেকানন্দজীর চিন্ত্মা ধারায় আগুয়ান হলে সকল মানুষই কিছু না কিছু করতে পারে।

স্বামিজী ও তাঁর মাতৃদেবী সীতাকুন্ড বর্তমান পঞ্চবটী স্থানে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথকে প্রণাম (৪০)

শ্রী অনিল মোহন কর

১৯৭৪ ইং সনে যবে আমার আগমন সীতাকুন্ড ধামে, সঙ্গে ছিল এক
আত্মীয়, যিনি করতেন চাকুরী অফিসার হিসাবে পদায়ন সীতাকুন্ডে।
আত্মীয় ভদ্রলোকের চাকুরী ছিল মধু পোকার বাসা তৈরী করার ট্রেনিং
দেওয়ার কর্মকর্তা তার সঙ্গে গিয়ে তথায় গেলাম উৎসবে আস্ত্মানবাড়ীতে।
তথায় দেখি স্বামিজীর জন্য উৎসব পালিত হচ্ছে তথায় স্বামিজীর জন্ম দিনে
কীর্ত্তন গাইছেন হরে কৃষ্ণ নাম তথায় রাখা আছে চারিদিকে স্বামিজী ছবি।
আমি সব দেখে এক ভদ্র লোক দেখতে পেলাম লম্বা একটি লোক দাঁড়ানো তথায়
তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলাম এখানে কোন রামকৃষ্ণদেবের দাড়্গিত লোক আছে কিনা?
উত্তর ভদ্রলোক এখানে কোণ দাড়্গিত লোক নেই, তবে তাঁর ভক্ত রয়েছেন অনেক তথায়
লোকটির নাম শ্রী অজিত নারায়ন অধিকারী পেশায় ওকালতি করেন তিনি।
হঠাৎ করে তখন কীর্ত্তন লন্ডভন্ড হল তীব্র বাতাসের তোড়ে ঝড় হল গুরম্ন
বাধ্য হয়ে কীর্তনায়া দল ছুটে গেলেন পাশে এক পরিত্যক্ত ঘরে।
মুখে হরিনাম কাঁধে মৃদঙ্গ, হাতে করতাল, দোতারা আরও কত বাজনা
চলছে নাছ হরি ধবনি ইত্যাদিতে ধুমাধুম বাজনা আরও কত কি।
এর পর কীর্ত্তন সাঙ্গ হলে ঝড় বাতাসও থেমে গেল নিমিশে ফিরার
পথে দেখালেন অধিকারী মশাই, রাস্ত্মার পাশে পঞ্চবটি রয়েছে তথায়।
জানতে পারলাম স্বামিজী মহারাজ এসে ছিলেন সেথায় তাঁর মাতৃদেবী সঙ্গেও দাড়ায়ে
দুজনে দর্শন করেছেন চন্দ্র-নাথ-ধাম পাহাড়ের উপরে ঝড় বৃষ্টি-ধারার মধ্যে।
যাওয়া হয়নি তাঁদের রাস্ত্মা ছিল পিছছিল ও বৃষ্টির কারনে প্রনাম হল মা বেটার
শ্রী শ্রী চন্দ্রনাথ ধাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজা পাছেন তথায়।
স্বামিজীও তাঁর মাতৃদেবী এসেছেন জেনে বিধির বিধানে পরম শ্রদ্ধারসাথে শুরম্ন
হল পঞ্চবটি সংস্কার ও জমি খরিদ করে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গড়ে উঠানো।

লোভ লালসা ছাড়লে পায় প্রভুর কৃপা (৪১)

শ্রী অনিল মোহন কর

আমি সারা নিশি কেঁদে কেঁদে জেগে বলি কবে

পাব দেখা প্রভু তব কোমল চরণ যুগল।

ভেবে পাইনি জীবনে কি করলে কি ভাবে জীবনে কেমনি পাব

তব সাক্ষাৎ এ কামনা সারাক্ষান মনে প্রানে।

আমি অতি দীনজন না জানি ভক্তি স্তোত্রাতি করতে তোমায়

আছে শুধু হাত দুখানা করতে করজোর তব প্রতি।

হে প্রভু দয়ার সাগর কর কৃপা অভাজনকে বলি অতি

মনে প্রাণে, আর তো নেই কিছু আমার তোমায় দেবার তরে।

জানি আমি তুমি কর দয়া তাঁদের প্রতি যারা মন প্রাণে

করে ভজনা তোমায়, হে দয়াল প্রাণনাথ আমার।

তব সৃষ্ট মানব জাতি এ বিশ্বে সদা তব প্রেম প্রীতি

তাঁদের প্রতি যাঁরা ত্যাগে ধন, রত্ন, আরও আপন জন।

মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে মন না দিলে কল্যান নেই (৪২)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী ১৮৯৫ খ্রীঃ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে ইউরোপ যদি বেদান্ত গ্রহণ
না করে তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সভ্যতার ইমারত ধ্বসে স্তুপে হবে পরিণত।
একেই স্বামিজী বলেছেন সভ্যতা, সভ্যতা দম্ভের প্রকাশ নয় মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে
জড়ের মধ্যে তিলে তিলে চেতনের ভূমিকাকে আবিস্কার করা।
এ জড় জগতের পশ্চাতে যে সত্য রয়েছে তাকে জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে প্রকাশ করাই
আমাদের কর্তব্য, বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রগতি মানুষের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়েছে।
শক্তির বৃহৎ আয়োজনকেই সভ্যতার চিহ্ন বলে মনে করছে মানুষের মধ্যে যা কিছু
বরনীয় তরে প্রকাশের তাগিদ নেই, স্বামিজার দৃষ্টি জড়ের উপর নয়, চৈতন্যের উপর
মানুষকে চিনেছে অসহায় একটি মাংসপিন্ড হিসেবে, দেখেননি, দেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে
নিদ্রিত, ভগবান, সেই চৈতন্যের আবরন উন্মোচিত হলেই নিদ্রিত নারায়ন জাগ্রত হয়ে উঠবেন।
তখন আমরা ভুমাকে পাব, আর ভূমৈব সুখম ভুমাত্বের বিজিজ্ঞাসি তব্যঃ
এই বড়োকেই জানতে হবে, একেই পেতে হবে, তিনি সকল সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে করেছেন প্রসারিত।
এই জড় জগতের পশ্চাতে যে চেতন সত্তা আছে, তারই প্রকাশে সবকিছু প্রকাশমান
এ কথা আমাদের জানা উচিত, সেই চৈতন্যেই নিখিল প্রানের উৎস।
এ কথা না জানলে প্রেম পরিব্যাপ্ত হবে না, আর আমাদের স্বার্থ-পরতা ঘুচবেনা
এই ব্রহ্ম দৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত চৈতন্যকে জানবে সাধনা, তা লাভ হবে এটাই প্রেমের বিকাশ।
সেই প্রেম চড়্গা দিয়েই জড়ের আবরন ভেদ করতে হবে, তবেই প্রতিষ্ঠিত হবে
বিশ্বলোক

মানুষের এই দৃষ্টি ভঙ্গি বদলালেই জগতের প্রকৃত কল্যান মানুষ যদি অধ্যাত্মিক লোভে মন দেয়, তবে কল্যান।

কর্মকরে খাওয়া প্রত্যেকের উচিত (৪৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

শতপথ ব্রাহ্মনে (১৪/১/১) উলেস্নখ আছে যে, অগ্নি ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবগন যজ্ঞ করে-ছিলেন

কুরম্নক্ষেত্রে তাঁরা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, কারা তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবেন।

তাঁরাই শ্রেষ্ঠ হবেন যাঁরা শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ আত্মত্যাগ দ্বারা যজ্ঞের ফল অবগত হবেন

তিনি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবেন, বিষ্ণু সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন।

অমিত-শালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগনের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করার জন্য ব্রহ্মচর্যের

অনুষ্ঠান করেছিলেন, তিনি সেই কর্মবলে দশদিক নভো-মন্ডল হতে বর্ষন করেন।

অশ্রমত্তচিত্তে ভোগ বিলাস বিসর্জন ও প্রিয় বস্তু সকল পরিত্যাগ করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন

এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতি পালক পূর্বক দেবরাজ করেন অধিকার।

ভগবান বৃহস্পতি ইন্দ্রিয় নিরোধক পূর্বক দেব রাজ্য অধিকার করেন, এজন্য তিনি

দেবগনের আচার্যপদ প্রাপ্ত হয়েছেন, সমাজ ব্যবস্থার জন্য পারম্পারিক সহযোগিতা মনোভাব চাই।

নিয়ত কাজ করার আদেশ রয়েছে কারন কর্মহীন জীবনে শরীরকে বাঁচানো

যায় না (গীতা ৩/৮) এ সব বলার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবন থেকে কর্মযোগীর দিয়েছেন দৃষ্টান্ত্ম।

কর্মে অনলস হয়ে কেহকাজ না করলে সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে

এমন কি (গীতা৩/২২-২৪) ঈশ্বরের আলস্যেও জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।

অলস পুরম্নষের দৃষ্টান্তে্ম সকলেই আলস্য পরায়নও কর্মে অমনোযোগী হলে সামাজিক

বিশৃঙ্খলা যথার্থই সম্ভব, ঐ নিয়ম ভঙ্গ করলে ভয়স্কর ক্ষতি ব্যক্তি সমাজের

আইন না মানলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয় আর প্রকৃতির মার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক

রবীন্দ্র নাথ তাঁর ঋণশোধ নাটকে তাই বলেছেন ঠাকুরদা যেখানে আলস্য ও কৃপনতা করেছেন তথায় ঋণশোধ ঢিল পড়েছিল।

কবি শ্রী রজনীকান্তের শরণাগতি (৪৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

১৮৬৫ সনে কান্ত কবি মাতা মনোমোহিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন পিতা ভগবত কবি গুরুপ্রসাদের পুত্র রঞ্জনীকান্ত হিসাবে পরিচিতি তাঁর মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে ক্যানচার রোগে আক্রান্ত। কবির প্রাণ মাতানো কণ্ঠে যাঁরা তাঁরগান শুনেছেন, তাঁদের জীবনেও ভক্তির বন্যা নেমেছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র লাল, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র অশ্বিনী কুমার ও গিরিশ ঘোষ প্রমুখ গুনীদের সাক্ষ্য থেকে আমরা জানি। কান্ত কবির অন্তরে অন্তরতম প্রদেশ হতে তাঁর ভগবত সত্তা কবিতা ও গানের মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ

করতঃ ধূপগন্ধ হয়ে ছড়ায় সেরূপ গানের মালা গেঁথে শ্রীভগবানের চরনে প্রণতি নিবেদন করেছেন সচিদ্র বাঁশীর ভিতর হতে পরিপূর্ণ সংঙ্গীতের আবিভাব যে রূপ, সে রূপ রোগক্রান্ত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হতে পরিপূর্ণ সংঙ্গীতের আবিভাব হত ও বিষয় কূপে নিমগ্ন হয়ে উদ্ধারের আশায় কাতর কণ্ঠে ডাকছেন।

আত্মীয় স্বজন পরিবৃত আনন্দ কোলাহল মুখরিত গৃহে কান্ত কবির মনে মাঝে মাঝে এক গভীর অতৃপ্তি দেখা দিত, জীবন দুর্বিষহ বোধ হত ও বিষয় কূপে নিমগ্ন হয়ে

স্বার্থময় পৃথিবীর নিঠুরতা ভরা প্রবঞ্চনা দেখে তিনি মর্মাহত ও অনসূচনায় মর্ম দাহী তাপে নিরন্তর তাপিত কবি শ্রী ভগবানের উদ্দেশ্যে গান গাইতেন।

তিনি এ সাধনার গান অনবদ্য বিনতির আত্ম নিবেদনে মহিমময় মোহ নিদ্রার আছন্নতাকে ভগবত কৃপায় দূর করার সুন্দর প্রয়াস করতেন ও ভগবানের উপর জোর করে দাবি জানাতেন।

তিনি যেন এতদিন নয়নে বসন বাঁধিয়া বসে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া বলে অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হচ্ছেন, যাহা এমনভাবে অধম মানুষকেও ভাগবতমুখী করে।

কবি স্থির জানালেন যে, তাঁও এই অধীর ব্যাকুলতা সেই করুনাময় শ্রীভগবানের চরন লাভ ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করবে না, ইহাই আমাদের শিক্ষানীয়।

শ্রমহীন জীবনকে অন্ত্মরের সঙ্গে ঘৃনা করতে শেখায় (৪৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না

যদিও কথাটি আমাদের জানা কিন্তু এর তাৎপর্য্য কত ব্যাপকতা আমরা সুস্থ ব্যক্তি করিনি চিন্ত্মা।

আমরা সকলেই সুখী হতে চাই অথচ তার জন্য পরিশ্রম করতে একান্ত্ম কাতর

আমরা জানি এ সংসারের বহু জনের শ্রমের বিনিময়েই বেঁচে আছি আমরা

অথচ আমি আমার কতর্ব্য টুকু করতে চাইনা সমাজের দশজনের কল্যান চিন্ত্মা না করে

স্বার্থপর জীবন যাপন করার আগ্রহী বেশীর ভাগ মানুষ।

সমাজ কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ-পরতা কর্তব্যবোধ ও সহযোগিতা এগুলি একমাত্র

স্লোগান নয় বাগাড়ম্বর নয়, এগুলোর একান্ত্ম আছে প্রয়োজনীয়তা।

এ গুলোর উপর ভিত্তি করে আদিম মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিলেন আর এগুলো সম্বল

করেই সভ্যতা বিকাশিত হয়েছে, এগুলোর অভাবে সভ্যতার অবড়্গয় অনিবার্য্য।

সে জন্যই যুগে যুগে, দেশে দেশে মহাপ্রান ব্যক্তিগণ এসে তাদের নিঃস্বার্থ কর্তব্য পরায়ন

মনোভাবকে তিরোহিত করেছেন, স্বামিজীর সেই বানীটি আজ বিশেষভাবে স্মরনীয়

যথা গাঁয়ে গাঁয়ে বা ঘরে ঘরে যা লোকহিত ও জগতের কল্যান কর, আপনার।

ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, নিজ মুক্তি ও ভক্তিপথের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়।

শ্রী শ্রী মায়ের একটি মাত্র উপদেশ আজকের যুগে অত্যন্ত্ম মূল্যবান, তার উপদেশটি এই

কাজ করে খাও বাবা, এ প্রসঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দজী বেলুড় মঠের ৫ম অধ্যড়্গ বলতেন।

যা-স্বামিজী বলেছেন ঠাকুরের একটি উপদেশ অবলম্বন করে বড় বড় পুস্ত্মক লেখা চলে

মায়ের শুধু এই উপদেশটী কাজ করে যাও বাবা এ নিয়ে কয়েকটি পুস্ত্মক লিখতে পারে

কোন অজুহাতে কাজ না করাকে বা কাজ না করার মানুষিকতাকে সকল দেশের

মহা পুরন্নষগনই কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন অথচ আজকাল কর্তব্য পালন না করে বিষাক্ত বীজানুর মত সমাজকে আক্রমন করছে।

সমাজের মঙ্গলের জন্য আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সবার মধ্যে এমন মনোভাবের সৃষ্টি করা যা শ্রমহীন জীবনকে অন্তরের সঙ্গে ঘনা করাতে শেখায়।

বাঁকুড়ার কোয়াল পাড়ার কৃষ্ণ ভক্ত হয়েও প্রত্যহ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যেতেন (৪৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাঁকুড়ার কোয়াল পাড়ার এক অখ্যাত পলস্নীতে

কৃষ্ণ পবন নামে এক দরিদ্র বৈষ্ণব বাস করতেন এবং যে আশ্রমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হরিনাম কীর্ত্তন হত তথায়।

যার ফলে গ্রামটি মুখরিত থাকত কীর্তনানন্দে গ্রামের লোকজনের চিত্তকে করত শান্ত্ম মনকে

করত ভগরত মুখী, অথচ আজ কালকার সমাজে সিনেমা বা ঐজাতীয় আনন্দ মানুষকে স্মাত করছে।

কবির ভাষায় "চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যবাদি
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা আড়ম্বর
শান্তি্ম যেথা ছিল সেখা স্বার্থের সময়।

ভক্ত কৃষ্ণ দাস তাঁদের কাজ করেই সংসার চালতেন, বার্ধক্য তাঁকে আক্রমন করেছে বিপত্নীক, দুটি কন্যা পুত্র ও পুত্র বধু এই নিয়ে তাঁর সংসার চলে।

কৃষ্ণ দাস প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা তুলসী তলায় বসে জপ ধ্যান করতেন আর সন্ধ্যার পর হরিনামের মালা নিয়ে পলস্নীর যথায় ভাগবত পাঠ ও নাম কীর্ত্তন হত তথায় যেতেন।

ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে ছিল অপূর্ব নিষ্ঠা সেটাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করত

বর্ষাকাল পলস্নীর দুর্গতি, তিনি রাত্রিতে আলো না নিয়ে জপ করতে করতে একস্থান হতে অন্যস্থানে যেতেন।

পথে কোথাও বিষধর সাপ দেখা গেলে দাঁড়িয়ে বলতেন যাও বাবা যাও

কি উদ্দীপ্ত বিশ্বাসী মন আর নিঃশঙ্ক চিত্তও অহিংসা ব্রতের একনিষ্ঠ সেবক।

কৃষ্ণ দাস যদিও যুগল মন্ত্রের উপাসক তথাপি তিনি শ্রীসারদা মঠের আন্তরিক

ভক্ত ছিলেন কোয়াল পাড়ায় ১৩১১ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে প্রত্যহ ভজনে সেথায় যেতেন।

এক রাতিত্রে তাঁর মশারীর ভেতরে একটি বিষধর সাপ দেখে মশারী উঠায়ে যাও বাবা যাও

বলে সাপটি ধীরে ধীরে চলে গেল, তাঁর একাগ্রতা নিষ্টা, দৃঢ়তা শরণাগতি সবই রাধাকৃষ্ণের স্তুতি ছিল।

তাঁর নাবালিকা পুত্র বধু ও দুটি কন্যা ছিল এক সন্ধ্যায় সান্ধ্যকৃত্য করার সময় তাঁর

পুত্রের সঙ্কটাপন্ন হয়ে মৃত্যু হলে পুত্র বধুও কন্যাদ্বয়ের কান্নার চিৎকারে জপ ধ্যান ভেঙ্গে যায়।

ওদের আর্তস্বরে কান্না শুনে এসে দেখেন ছেলে পরমার্থিত জীবনের মহাদেশে চলে গেছে

কৃষ্ণ দাস একটি লন্ঠন হাতে নিয়ে গ্রামের লোকজন ডেকে এনে পুত্রের অন্তত্মষ্ঠি ক্রিয়া করান।

শেষ কৃত্য শ্রাদ্ধাদির পর প্রয়োজনীয় অর্থ গচ্ছিত রেখে নরদেহে ছেড়ে বৈকুঠে চলে গেলেন

ভগবানের লীলাতে যারা আনন্দ পান না তারা সংসার সাগরকে ভয় করেন না।

তাই কবি বলছেন:- "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা
এ সমুদ্রে আর কভু হয়ো নাকো পথ হারা।"

শ্রী রামকৃষ্ণ বলেন শুদ্ধ ভক্তের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী (৪৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই লীলাময় ভগবানের লীলা মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে চলছে

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন শুদ্ধভক্তের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী।

মানব সমাজে সবদেশেই দেখা যায় কোন না কোন মানুষের মধ্যে

সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিশেষ প্রকাশ সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাঁদের অন্তলীন পবিত্রতার দিব্য মহিমা প্রশান্তি ও প্রতিশ্রন্নতি, আদর্শ জীবনের

জন্য আত্ম বিলয়ের আনন্দ এবং নিরলস সেবার ভাব ভগবত শক্তির দুএকটি কিরন রেখা মাত্র।

আভাসে ইঙ্গিতে কিছু পরিমানে নিকট ও দূরের মানুষের মনকে স্পর্শ করে

এঁদের পবিত্র জীবন ও স্মৃতি এরা মানুষের স্মৃতিকে আশ্রয় করেই তাদের কল্যান করে।

এঁদের জীবন ভাগবত ভাবনা ও বিশ্বাসের যেন সচল বিগ্রহ একটি জ্বলন্ত

দীপকেই জ্বালতে পারে অন্য দীপকে যেমন সভ্যতার ইতিহাসে রামকৃষ্ণের জীবন যুগান্তকারী।

জ্ঞানীর মায়াকেই তিনি বলেস্নন মহামায়া, মায়া ব্রহ্মের শক্তি, অভিন্ন, শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রত্যক্ষ্য করলেন সীমার মধ্যে অসীমকে, নশ্বরের মধ্যে অবিনশ্বরকে মর্ত্তের মধ্যে অমত্যকে।

জীবনের মধ্যে শিবকে, বিশেষত নারীর মধ্যে বিশজননীকে, তিনি যেন এক মহান

আলোক-বর্ত্তিকা তাঁর প্রেমই যেন আমাদের প্রকৃত আশ্রয়স্থল।

প্রেমিক এই মহাপুরন্নষ নিজের সমাধি-সুখ চাননি, চেয়েছিলেন মানুষের ব্যথায় জর্জর

জীবনকে শান্তির পথ দেখাতে, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দূর্বল দিগকে ঈশ্বরকে নিয়ে করতে জীবন ধারন।

তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে আহবান জানালেন শিক্ষা দিলেন, প্রেরনা দিয়ে লোক শিক্ষার

দায়িত্ব অর্পন করলেন বিবেকানন্দকে মানুষ তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের দিলেন শিক্ষা।

অমর আত্মার মহিমার বাণী উচ্চারন করে দুর্বল মানুষকে নির্ভীক হওয়ার আহবান জানান

তিনি সকলের কাছে বলেন বলিষ্ট ভাষায় ও আত্ম প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় পরম আকুতিতে।

তন্ত্রে ব্রহ্ম শক্তিকে মাতৃরূপে আরাধনার বিধান আছে (৪৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

বহু শক্তির সহযোগে আমাদের দেহের কাজটি চলছে, শ্রবন শক্তি, দৃষ্টি শক্তিও প্রান শক্তি
মন ও বুদ্ধির শক্তি ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন শক্তিমান হলেও
বিজ্ঞানীর জড় শক্তিই সাধকের ধ্যানে চৈতন্যময়ীরূপে দেখা দেন, এক সর্বব্যাপী চৈতন্য শক্তির
প্রকাশ দেখা যায় জগতে বিভিন্ন বিচিত্ররূপে, সেই চিন্ময়ী শক্তিই মাতৃ রূপে আরাধ্যিতা।
বিশ্বের সবকিছুই জন্ম দাত্রী বলে তিনি মা, মায়ের সঙ্গে পালনের ভাব খুবই নিকট
আবার সৃষ্টির উল্টো দিক হল ধ্বংস, ধ্বংস না হলে নতুন সৃষ্টি অসম্ভব।
তাই তাঁকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী বলা যায় সৃষ্টি ও প্রলয় বলতে শক্তির ব্যক্ত
ও অব্যক্ত অবস্থা মাত্র বুঝায়, আধুনিক বিজ্ঞানও তাই বলে, শক্তির বিনাশ বা হ্রাস নেই।
জগজ্জননীর এই রূপ প্রত্যক্ষ্য করে ছিলেন এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি গঙ্গা
হতে উত্থিত হয়ে ধীর পদক্ষেপে পঞ্চবটিতে আগমন করেন।
দেখলেন ঐ রমনী পূর্নগর্ভা, পরে দেখেন ঐ রমনী তার সম্মুখেই
এক সুন্দর কুমার প্রসব করে তাকে কত স্নেহে স্তন্য দান করছেন।
পরক্ষানে দেখেন রমনী কঠোর করাল বদনা হয়ে ঐ শিশুকে গ্রাস করে পুনরায়
গঙ্গা গর্ভে প্রতিষ্ঠা হলেন, তাই শ্রী-রামকৃষ্ণ-দেব বলছেল ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।
যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি,অগ্নি মানলেই
দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না।
একই ভাবেই মাতার ঈশ্বরভাব ও ঈশ্বরে মাতৃভাব, এসেছে, মাতৃভাব, প্রকৃত পক্ষ্যে শক্তি ভাব
অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষ্যা নারী মুর্ত্তিই শক্তির প্রতীক তন্ত্রে ব্রহ্ম শক্তিকে মাতৃরূপে আরাধনার বিধান আছে।

স্বামী বিবেকানন্দজীর ‘বহু’ ও ‘এক’ সত্যের প্রকাশ (৪৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

‘বহু’ ও ‘এক’ একই মত্যের প্রকাশ এই বাণীর সবচেয়ে গুরম্নত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য হলে যে এটি সত্য হলে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মই সত্য।

তাই প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা হবে এক, কারো চেয়ে কারো মর্যাদা কম বা বেশী হবে না, প্রত্যেকেই অধিকারও হবে এক, তা হলে যারা ধর্ম চর্চ্চা বা পুরোহিত ব্রাহ্মনের অধিকার থাকে না।

সেই জন্যই স্বামিজীর প্রত্যেকেই তার স্ব স্ব ড়্রোত্রে মহান, ‘বহু’ ও ‘এক’ যদি একই সত্যের প্রকাশ হয়, তাহলে মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নেই।

বস্ত্মতঃ স্বামিজীর ‘হিন্দুধর্ম’ শীর্ষক ভাষনে এক বৈপস্নবিক নতুন নীতিতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, স্বামিজীর ঘোষনা কলা, বিজ্ঞান এবং ধর্ম-একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ।

যেহেতু ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তিতে ধর্ম বিজ্ঞান এবং কলা সবেরই প্রয়োজন সে জন্য তাদের সাধারন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া খুবই দরকার।

এই সাধারন ভিত্তিভূমির সন্ধান স্বামী-বিবেকানন্দ তার শিকাগো-ভাষনে দিয়েছেন বাণী ও রচনার ভূমিকায় নিবেদিতা অসাধারন দড়্রাতার সঙ্গে দেখায়েছেন।

ভারতের সত্য দ্রষ্টা ঋষিদের যে অভিজ্ঞতার কথা শাস্ত্রে গ্রন্থসমূহে লেখা আছে তা আকস্মিকভাবে লব্দ নয়-সেগুলো বিচার বিশেস্নষনের পর প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত্ম অবশই যুক্তিগতভাবেই সংগঠিত।

বিজ্ঞানের দাবি-প্রত্যড়্রা প্রমান দিতে হবে তাই বিবেকানন্দও চেয়েছিলেন শাস্ত্রোক্ত বিষয় সমূহের প্রত্যড়্রা প্রমাণ, না হলে তাঁ যুক্তি ও বুদ্ধি কোন মতেই সন্তুষ্ট হচ্ছিল যে, এ প্রমাণ প্রত্যড়্রা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

সমাধি ছিল যাঁর নিত্য অভিজ্ঞতার বস্তু জ্ঞান লাভের নিত্য মাধ্যম, পরবর্তী কাল নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্দি সমূহের মধ্যেও তিনি শাস্ত্রের প্রমাণ পেয়েছিলেন।

এক হাতে সংসার করা অন্য হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে রাখতে হবে (৫০)

শ্রী অনিল মোহন কর

যাতা যখন ঘোরে তখন সমস্ত্ম ডালই পিয়ে যায়, কিন্তু খটির কাছে যে দুই একটি থেকে যায় সে গুলো পিষে যায় না, অড়্গাত থাকে।

একমাত্র ঈশ্বরকে ধরে থাকলেই সংসারে মৃত্যুকে জয় করা যায়, কঠ উপনিষদে স্লোকে আছে (২/১/১৫) যেমন করি বিন্দু সমুদ্রে পড়লে সব একাকার হয়ে যায়।

বিন্দু বিন্দু সিন্ধুই হয়ে যায়, সেই রকম ভক্ত তন্ময় চিত্তে তাঁর সঙ্গে সর্বদা নিজকে যুক্ত রাখতে হবে, কোন ক্রমেই যেন তাঁর থেকে বিযুক্ত না হয়।

এইট ভক্তির পরাকাষ্টা তাঁকে নিয়ে সাধন যেন সমগ্র জীবন জুড়ে হয় এ জিনিস একদিনে হবে না, অভ্যাস ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ভগবান অর্জ্জনকে বলেছিলেন-হে অর্জ্জন কল্যাণকারী ব্যক্তির কখনও দুর্গতি হয় না সব সময় লড়্গ্য রাখা উচিত হবে যেন নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা না করি।

অকপট প্রয়াস এবং সরল অন্তঃকরন দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহা সর্বদা মনে থাকলে উদ্দেশ্য সফলতা আসবেই।

ভাগবতে আছে মরনশীল জীব কালের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে আর কাল তার পিছন পিছন ছুটছে, জীব ভাবছে কোথা গেলে সে বাঁচতে পারে।

তখন মনে হল দেবতারা স্বর্গে গিয়ে অমর হয়,কিন্তু সেখানে গিয়েও দেখল মৃত্যুভয় আছে সেখানে, সেখান থেকেও তখন ছুটছিল সে।

একদিন দেখল সে ভগবানের শ্রী-পাদপদ্মে পড়ে আছে, তাই এ ত্রিভূবনে কোথাও আশ্রয় নেই, একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে ঈশ্বরের পাদপদ্মে, তাই ইহা যেন কোন ক্রমে আমরা না ভুলি।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় এক হাতে সংসার কর, আর অন্য হাতে তাঁকে ধরে রাখতে হবে, তাতেই কোন আপদ বিপদের আশংঙ্খা থাকবে না।

অবতারকে বিচার করতে করতে তাঁর কৃপা হলে বুঝা সম্ভব (৫১)

শ্রী অনিল মোহন কর

শ্রীঠাকুর বলছেন, ছোট-ছেলে মেয়েরা ঝগড়ার সর্বদা বলে ঈশ্বরের দিব্যি তারা কি বুঝে ঈশ্বরের ইহা তাদের বড়দের কাছে শুনা, তাই শুনা কথা আওড়ায়ে যাচ্ছে।

আমরা যখন অবতার বলি, তখন তা কথার কথা, তাই যখন অবতারের কথা বলি তখনো ঐ রকম এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমরা যদি অবতারকে বলে ধারনা করি তখনও ঐ রকম

তবে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি না পারি যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর জীবন আলোচনা করি বা তাঁর কথা ভাবি, তাহলে ভেবে ভেবে আমাদের অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র হবে।

তখন সেখানে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হবে সেই আসনে তার অধিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা ধীরে ধীরে অবহিত হতে পারব, তার দ্বারা আমাদের জীবন কৃতার্থ হবে।

ইহা অবহিত হওয়া দুদিনের জানার কারণ নয়, আমরা যে ঠাকুরকে অবতার বলছি তা তাঁর আবির্ভাবের বহু বছর পর এ কথা ও আলোচনা হাজার হাজার বছর ধরে চলবে।

মানুষের ধারনা শক্তি বাড়তে বাড়তে যতদিন না তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবে ততদিন চলবে, তার পরের কথা আমাদের অজানা, তাই আমাদের সচেতন হতে হবে একটা অসাধারণ যুগে জন্মেছি আমরা।

শুধু মুখে 'রামকৃষ্ণ' রামকৃষ্ণ বলবে এ যুগে জন্মনোর সার্থকর্তা পুরাপুরি হবে না আমাদের দেখতে হবে, সেইভাব আমরা আমাদের জীবন-চর্চার্য কতটা গ্রহন করতে পেরেছি।

তাই অবতারকে বুঝা অত্যন্ত দুরন্নহ ব্যাপার দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে সমগ্র জীবনকে বিচার করতে করতে তারপর তার কৃপা হলে তাকে বুঝা সম্ভব হবে।

ভববান বুদ্ধদেব এক এক ব্রাহ্মনের দর্প চূর্ণ (৫২)

শ্রী অনিল মোহন কর

বহুকাল পূর্বে কোণ এক ধনী ব্রাহ্মণ চাষী আনন্দের সঙ্গে নতুন ফসল কাটার কাজে ব্যস্ত্ম, ব্রাহ্মন চাষীর নাম ভরদ্বাজ, তখন বুদ্ধদেব রাজগৃহের কাছে থাকতেন।

বুদ্ধদেব রাজগৃহের কাছে বাস করলেও ভিড়্গা করেই দিন চলত, স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধদেব ভিড়্গা পাত্র নিয়ে ভিড়্গার উদ্দেশ্যে মাঠের দিকে গেলেন।

ব্রাহ্মন চাষীটি বুদ্ধদেবকে দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে চড়াসুরে অন্ন ভিড়্গা করার চেয়ে মাঠে শ্রমিকদের মতো কাজ করে খাও বলে বীরদর্প কাজ করে খেতে বীরদর্পে বলল।

বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে বুদ্ধদেব শান্ত্মভাবে বললেন, হে ব্রাহ্মন আমি ভূমি কর্ষন ও বীজ বপন করি, এতে আমার আমার অল্প সংস্থান হয়ে থাকে।

উত্তরে ব্রাহ্মন প্রশ্ন রাখেন তোমার হাল কোথায়, তোমার বলদ কোথায় বীজই বা কোথায়? বুদ্ধদেব বলেন আমি ধর্মবীজ বপন করি।

সৎকর্মরূপ-বর্ষনই সেই বীজকে অস্কুরিত করে, বিবেক ও বিনয়ই আমার হাল আমার মনই বল্গা ধারক, আমি ধর্মের হাত ধরে সর্বদা থাকি।

আগ্রহই আমার চালক, উদ্যমই আমার, জলবাহী বলদ, মানব-মনে অজ্ঞানের যে আগাছা তার উচ্ছেদের জন্যই আমি হাল কর্ষন করি।

এতে যে অমৃত ফসল উৎপন্ন হয় তার নাম নির্বান, ত্রিপাপের জ্বালা দূর করে এ বস্তু, ব্রাহ্মন হতদর্প ও বিন্ময়ে বিমূঢ়।

সর্ব-তমোনাশ বিস্বান সূর্যের মতো বুদ্ধ আবিভূত, দুর্বার সত্যের তেজে সমুজ্জল ও প্রতিবোধ্য, অভ্রান্ত্ম সত্যের জ্বলন্ত্ম উপস্থিতিতে ধর্ম-অন্ধকার দূরীভূতহলে ব্রাহ্মন শ্রদ্ধানুচিত্তে ভিড়্গা দিল।

প্রকৃত ভক্ত ও শ্রীভগবানের কান্ড (৫৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

ভক্ত সকল শাস্ত্রীয় বিধানে অনেক কথা, এ ভক্ত হওয়া মানে অনেক বড় মানের মানুষ হওয়া, সামান্য কথায় ভক্তের শাব্দিক অর্থ বুঝানো সম্ভব নহে।

তাই ভক্তের তত্ত্ব কথা কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে ভক্তের প্রতি ভক্তকে রড়্গাকারী কান্ডারীর দয়ায় দু'চারটি কথা বনর্না করার চেষ্টা করা গেল।

কান্ডারীর ভক্তের প্রতি কেমনতর আবদার আবার প্রকৃত ভক্তের কান্ডারীর প্রতি কেমন আন্ত্মরিক টান না থাকলে এমততর উক্তি সাধক করবেন না।

তাই কান্ডারী বলছেন, আমি ভক্তের তরে ঘুরি সংসারে, ঘুরিয়ে বেড়াই ভক্ত খোঁজে ভক্ত পূজে মোরে, আমি পূজি তারে, ভক্ত ছাড়া আমিও নেই।

ভক্ত আমার মাতা-পিতা, ভক্ত আমার শুরম্ন, ভক্ত সেধে নাম রেখেছে আমার বাঞ্চা-কল্পতরম্ন, আমি তাই ভক্তের মুখে সদাই।

ভক্তের যা থাকে সবই দেয় আমাকে তখন আমি দিয়ে চরণতরী হয়ে কান্ডারী ভবসিন্ধু পার করি, তাই আমি ভক্ত খোঁজে বেড়াই সদা।

তেমনি ভক্ত তাঁর ভালবাসার বস্তু তার কান্ডারীকে না খাওয়ায়ে খাবে না নিজে, ইহাই প্রকৃত তাত্ত্বিক মর্ম-কথা আমরা সকলে উচিত বুঝা।

স্বামিজী-আধখানা কলা শ্রীঠাকুর পূজায় দিয়ে শশী মহারাজের ঘুষি খেলেন (৫৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামী প্রেমানন্দজী তার অফুরন্ত প্রেম ও মমতার জন্য প্রবাদপুরুষে পরিনত হয়ে উঠি ছিলেন এহেন প্রেমানন্দজীও বেশ বকা ঝকা করতেন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সীদের।

এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের আচরনের কথা উলেস্নখ করা যেতে পারে, ঘটনাটি হয় ভগ্ন স্বাস্থ্য উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবাবেশের দরুন স্বামিজী প্রায়ই মেজাজ খারাপ করতেন

তবে তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা আর মমতার কথাও জানত, স্বামিজী বেলুড়মঠে এক নিয়ম দিলেন। দুপুরে কেউ ঘুমাতে পারবেনা, ঘটনা চক্রে এক দুপুরে দেখা গেল স্বামী প্রেমানন্দজী দুপুরে ঘুম।

স্বামিজী ক্রোপে গিয়ে তাঁকে বিছানা থেকে ফেলে দিলেন, কিছুক্ষান পর স্বামিজী কানাই মহারাজকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন, প্রেমানন্দজীকে, তিনি আসলে স্বামিজী পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু।

স্বামিজী তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করলেন যে, ঠাকুর তোকে এত ভালবাসতেন আর আমি এভাবে এত কষ্ট দিলাম তোকে, একবার শশী মহারাজের অনুরোধে স্বামিজী মন্দিরে পূজা করতে গেলেন।

আধখানা কলা ছাড়ানো একটি কলা শ্রীঠাকুরকে নিবেদন করে স্বামিজী বললেন ঠাকুর গ্রহন করো, তুমি আজ যা জুঠায়েছ তাই দিয়ে তোমার নৈবদ্য দিলাম।

স্বামিজীর এ আচরনের শশী মহারাজ প্রচন্ডে রেগে গিয়ে পিঠে সজোরে একটা ঘুষি মেরে বললেন, স্বামিজীর কোন প্রতিক্রিয়া নেই তবে অন্য গুরু ভাইরা গেলেন রেগে।

তখন স্বামিজী বললেন ওর ভাব থেকে ও যা করেছে, ঠিকই করেছে, আবার আমার ভাব থেকে যা করেছি সেটাও ঠিক, ঠাকুর অন্যের ভাবাবেগে কখনও বাঁধা দিতেন না।

ভক্তের নামে রম্নচি হলে, বাঁচার পথ হোল (৫৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

অহল্যাদেবী বলে ছিলেন, হে রাম যদি শূকর যোণিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই,

কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে আর কিছু চাই না।

ভক্ত কায়মনোবাক্যে তার ভজনা করে সে জানে তিনিই জীবজগৎরূপে বিরাজমান

কাজেই জীবের মধ্যে ও তিনি আছেন জেনে সেবা করেন।

হাতের দ্বারা তাঁর সেবা পূজা, পায়ে তার স্থানে যাওয়া, কানে তার কথা শুনা

নাম-কীত্তন শুনা, চড়্ো তাঁর বিগ্রহ দশন, মনে সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্ত্মা করা।

যাদের সময় নেই, তারা যেন সন্ধ্যা, সকালে হাততালি দিয়ে এক মনে হরি বোল,

হরি বোল বলে, তার ভজনা করে, যিনি পাপ হরন করেন তিনি শ্রী হরি।

হরি ত্রিতাপ হরন করেন (কথামৃত) আগে লোকে কত তপস্যাদি করত, এখন

কলির জীব, অন্নগত প্রান, দুর্বল মন এখন এক মাত্র হরি নামই সাধন।

একমনে করতে পারলেই সংসার ব্যাধি নাশ হবে, আবার অনুরাগ ও ব্যাকুলতার

সঙ্গে নাম না করলে, তাঁর ভজনা না করলে বিশেষ ফল হয় না।

নাম মাহাত্ম্য যখন বুঝা যায়, যখন বিষয় বাসনা ত্যাগ করে তার জন্য

ব্যাকুল হওয়া যায়, “যাহা বাম তাহা নেহি কাম, যাহা কাম”।

প্রার্থনা করলে তিনি পূর্ন করেন তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়

কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা পালিয়ে যায়।

নামে রম্নচি হল বাঁচার পথ হোল, তন্নামে অরম্নচি হলে আশা নেই যদি নাম

করতে করতে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তাহলে আর ভয় নেই, তার কৃপা হবেই হবে।

ভগবান সর্বত্র সর্বজীবের ভিতরে থেকে সবই দেখেন (৫৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

বীর হৃদয় যাঁর তিনিই কেবল ভগবানের পথে চলতে পারেন আমাদের পদে পদে প্রার্থনা-হে প্রভু আমাকে, আমার আত্মজনকে কর রক্ষা।

সংসারের সবই যেন সুখে-সাচ্ছন্দে থাকে দিনের পর দিন জাগতিক প্রার্থনার পরম্পরার মধ্যে ভগবানকে কতক্ষান চাইছি, যদা যা নিয়ে মত্ত আছি, সবই তো চাইছি তার কাছে।

এই মূলধন, সম্পদ নিয়ে আমরা ভগবানকে কি করে চাইব? যিনি অমূল্য তাঁকে পাবার জন্য মূল্য দিতে হবে, কি আমরা প্রস্তুত রয়েছি, ভয় নেই, ভগবান সকলেরই পথ করেছেন।

আমাদের মতো যারা মন্দ বৈরাগ্যবান, যারা ধীর হৃদয় নয়, যাহা আর্ত হয়ে হে প্রভু রক্ষা কর বলে তাঁর শরণাপন্ন হয় তাদের তিনিই রক্ষা কর্ত্তা তাদের।

তেষামহং সমুদ্ধতা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ (গীতা-৬/৩০) আমি তাদেরও সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি বলে ভগবান অভয় দিয়েছেন, কাজেই আমাদের আশা ও ভরসা আছে।

তবে মনে রাখতে হবে, পথটি বড় দুর্গম বন্ধর, নানান উত্থান-পতন আছে। সে পথের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, যত বাধাই আসুক, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এগুতেই হবে।

তার জন্য মনকে যদি এখন থেকে প্রস্তুত করে রাখি তাহলে তার দিকে যেতে পারব ভগবানকে যে ভালবাসবে তার স্বার্থ বুদ্ধি তত কমবে।

আর ভগবান সর্বজীবের ভিতরে আছেন জেনে সর্বত্র তাঁকে দর্শন করে সকলের সেবা করবে গীতা-৬/৩০ স্লোকে বলেছেন যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং আমাকেও সমস্ত বিশ্বকে দেখেন।

আমি সেই একাত্মদশীর কাছে কখনও বিনষ্ট হই না, তিনিও আমার কাছে বিনষ্ট হন না। ভগবান সর্বদাই একেবারে নিকটে থাকে, তাঁর হাত ধরে থাকেন সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন।

স্বামিজীর শিকাগো ভাষনে আমেরিকার কিছু শিক্ষিত লোক ভারত সম্বন্ধে উচ্চধারনা (৫৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

আমেরিকার বুস্টনে স্বামী- অখিলানন্দ ছিলেন আশ্রমের অধ্যক্ষ আশ্রমটি একটি বড় নদীর ধারে ও খুবই সুন্দর, স্বামিজী জানালেন যে, ঐ আশ্রমের ব্যয় বহন করেন এক মহিলা।

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন বাড়তে বাড়তে প্রায় ঐ আশ্রমে কাছে পৌছেছে ও ভারসিটি কর্তৃপক্ষ এক লক্ষ ডলার দিয়ে ঐ বাড়ীটি কেনার প্রস্তাব করেন।

কিন্তু স্বামিজী তা প্রত্যাখ্যান করেন, এ দিকে স্বামী অখিলানন্দও দেহ রক্ষা করেছেন

তখনকার সময়ে অনুমান করা যায় যে, সখ্যায় অল্প হলেও একদল পুরুষ ও মহিলা স্বামিজী ও শ্রীঠাকুরকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে আমাদের একটি জাতীয় কলঙ্কের কথা উলেস্নখ করে বলা যায় যে আমেরিকার অনেক শিক্ষিত লোকের ধারনা ভারতবাসী মাত্রই স্বামিজীও তার প্রচারিত ধর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নয়।

তাই আমেরিকানরা ভারতবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আলাপ হলেই এ সম্বন্ধে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চান, কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকাবাসী ভারতীয় ৯৯% এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাঁরা রামকৃষ্ণ ভাবধারা বা স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেকেই কিছু শেখেননি ও জানেন না বিষয়টি দেশের বহু ভারতের সরকারী বড় পদধারীকে বলেস্নও লাভ হয়নি।

অথচ সরকার শত শত যুবককে বৃত্তি দিয়ে আমেরিকা পাঠান হলেও স্বামিজী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হয়নি।

যাহা অতি সহজভাবে ভারত সরকার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীবিবেকানন্দ সম্বন্ধে সহজ বোধ্য বই পড়বার ব্যবস্থা করলেই একাজটি হতে পারত,যা বর্তমানে হচ্ছে।

গৌতমবুদ্ধ কিভাবে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন (৫৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

রাজা শুদ্ধোধনের ছেলে বুদ্ধদেব জন্মের পর কুষ্টি তৈরী করালে ফলাফলে দেখা গেল ছেলেটি জীবনে রাজচক্রবর্ত্তী বা সন্ন্যাসী হবেন।

পিতা ভাবলেন ছেলে রাজচক্রবর্তী হলে উত্তম আর সন্ন্যাসী হলে তো মুসকিলের কথা রাজার ছেলে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করলে তো কথাটা কেমন কেমন মনে হয়।

তাই ছেলের চোখে যেন কোন জরাব্যাধি মৃত না পড়ে তাই এ তিনটি থেকে ছেলেকে সরায়ে রাখতে হবে, কারণ এগুলি চোখে পড়লে বৈরাগ্য প্রবন জ্বলে উঠবে।

আর একে সংসারে রাখা যাবে না কাজেই ছেলেকে যাতে সব সময় আনন্দে মগ্ন থাকে তাই করতে হবে, সেজন্য পিতা আনন্দ-নিকেতন তৈরী করে ছেলে রাখলেন।

তবে বুদ্ধদেব এ সবের ভিতরে থেকেও তাতে তিনি মগ্ন হয়ে যাননি বা বিচার হারাননি, সদা-সর্বদা চিন্ত্মায় মগ্ন হয়ে থাকেন, তবে একদিন মনে সাড়া আসল।

সেই মনের সারায় প্রাসাদের বাহিরে কি রয়েছে দেখার সাধ আসল, তখন শুদ্ধোধনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, তাই রাজা আদেশ জারী করলেন।

ছেলে রাস্ত্মায় বের হলে চোখে যেন কোন জরাজীন রোগী, কোন মৃত্যুর দৃশ্য চোখে না পড়ে, খুন আনন্দ-উৎসাহের সঙ্গে ছেলে বেড়াতে যাবে।

এদিকে দেবতারা রাজার সঙ্খল্পকে ব্যর্থ করার জন্য একটি রম্নগ্ন ব্যক্তিকে বুদ্ধদেবের যাত্রা পথে রেখে দিলেন, সেই রম্নগ্ন ব্যক্তিকে দেখে খুবই অবাক হলেন।

জিজ্ঞেস করলেন এর কী হয়েছে, কাতরাচ্ছে কেন, এর কি হয়েছে, সারথি বলস্ন এর রোগ হয়েছে, সবাইর এমন হয়, বুদ্ধ বলেন আর যেতে হবে না, তিনি চিন্ত্মা মগ্ন হয়ে ফিরলেন।

ভাবতে লাগলেন, এই নাচ, গান, আনন্দ এসব দেহ রম্নগ্ন হলে তো আর আস্বাদন করা যায় না, তিনি তাই গভীর চিন্ত্মায় মগ্ন হয়ে দিন কাটতে লাগলেন।

আবার একবার ইচ্ছা হল শহর দেখবেন তাই ব্যবস্থা হল যাবার, তবে এরূপ দৃশ্য যেন রাস্ত্মার চোখে না পড়ে, যাচ্ছেন রাজ কুমার একটি জরাজীর্ন বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে চলছে।

এটা দেখে জিজ্ঞাসায় জানল বয়স হয়েছে, শরীর অসুস্থ বয়স হলে সকলেরই এমন হয়, তবে আর যেতে হবে না, ফিরে চল বুদ্ধদেব আরও চিন্ত্মা মগ্ন হলেন।

আরেক দিন গেলে রাস্ত্মায় একটি লোক মরে পড়ে আছে, বুদ্ধ জানতে চাইলেন এর কারন কি

বয়স হলে সকলেরই এমন হয়, আরেক দিন বের হলে রাস্ত্মায় এক সন্ন্যাসী দেখেন।

পরিধানে পরিত্যক্ত বস্ত্র, কোন সাজ পোষাক নেই, কিন্তু মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি পরিপূর্ণ বুদ্ধদেব মুগ্ধ হলেন, আনন্দে বিভোর হয়ে আছে মন, এটা দেখে তাঁর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন।

১৮৯৩ সনে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে শেষ দিনের ভাষনে স্বামিজীর পটভূমি (৫৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে শিকাগো ধর্ম সম্মেলন এমন একটি যুগের সৃষ্টি করেছিলেন
যার মূল্য ও গুরম্নত্ব যতদিন যাবে ততই গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে।
কোটি কোটি মানুষের পড়া থেকে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতিনিধিরা মঞ্চের ওপর উপস্থিত
দৃশ্যটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় বেভারেন্ডজন হেলরীর ভূমিকা।
তাঁরই কায্য বিবরনীর প্রামান্য ইতিহাস থেকে একটি অংশ বিশেষ থেকে বর্নিত
যাহা নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগেই প্রাসাদটি পতিনিধি ও দশর্কে ভর্তি।
বিভিন্ন স্থান হতে আগত দেশ বিদেশের চার হাজার উৎসুক শ্রোতবৃন্দ কলম্বাস হল
পূর্ণ হয়ে গেল, বারটি ধর্মের প্রতিনিধিরা হাত ধরাধরি করে মঞ্চে গেলেন।
কেন্দ্র স্থলে আমেরিকার গির্জার প্রধান যাজক কার্ডিনাল গিবত্তর্স উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পোষাকে
সজির্ত হয়ে উচ্চাসনে সমাসীন, তিনিই এই মহাসভা উদ্বোধন করবেন।
দুপাশে উপবিষ্ট ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মানুগামীদের মধ্যে উপবিষ্ট মনোরম
উজ্জ্বল রক্তিম পোষাক পরিহিত, তাম্রাভ মুখ মন্ডলের ওপর সকলের দৃষ্টি।
তিনিই বৃহৎ পীত উষ্ণীর শোভিত বোম্বাইয়ের বাগ্মী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দিকেই
সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, তার পাশে পীত, লোহিত ও শুভ্র পরিচ্ছদ এক লোক।
তিনি ভারতের একেশ্বরবাদী সমিতি বা ব্রাহ্ম সমাজের বি.বি. নাগর কর ও সিংহলের
বৌদ্ধ পন্ডিত ধর্মপাল বসে ছিলেন, ধর্মপাল চার কোটি সাতলড়া হাজার বৌদ্ধের অভিনন্দন বয়ে এসেছিলেন।
তাঁর কৃশ ক্ষুদ্রদেহটী শুভ্রবেশে সজ্জিত ছিল ও কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ কাঁধের ওপর
এসে পড়েছিল, তথায় মুসলমান, পারসী ও জৈন, ধর্ম যাজকেরাও ছিলেন।
সর্বাধিক জমকালো দেখাছিল রামধনুর বিচিত্র বর্ণের দামী-সিস্কের বেশ ভুষায়
জাপান ও চীনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের, গয়ার বৌদ্ধধর্ম, তাওধর্ম, কনফুসিয়ান ও শিষ্টো ধর্মের প্রতিনিধি।
এভাবে নানা ধর্মের ধর্মযাজক বহুরূপে সজ্জিত হয়ে, এমনকি কোমড় থেকে ঝোলানো বৃহৎ
রৌপ্য নির্মিত এশ ইত্যাদি বেশে বসে নানা ধরনের গল্প করছিলেন।
সেদিনই স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম মহাসম্মেলের প্রদত্ত সর্বশেষ ভাষন এ বিশ্ব সমাবেশকে
অশোকের বৌদ্ধ সঙ্গীতি এবং আকবরের সভার সঙ্গে তুলনা করে নিজস্ব মূল্যায়ন ব্যক্ত করছিলেন।

হরিতকী সংগ্রহের জন্য শ্রীগুরুর নির্দেশে ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করে সংসারী হয়ে ও শ্রীকৃষ্ণ লাভ (৬০)

শ্রী অনিল মোহন কর

আমাদের জীবনে দুঃখ একটি অপরিহার্য ঘটনা তাই দুঃখের মহাজনেরা নিয়েছিল বিধাতার দান
হিসেবে দুঃখকে হৃদয় দেবতার পূজার এক আশ্চর্য উপকরন রূপে মেনে নেবার মঙ্গল-কারক।
এই পূজার আকাঙ্খা জাগলে এবং এ পূজা অভ্যাস করতে পারলে দুঃখ আমাদের অভিভূত
করতে পারে না বরং আমাদিগকে শান্তি ও বৃহত্তর কল্যানের পথে যায় নিয়ে।
তাই যীশুখৃষ্ট বলেছেন, যাহাদিকের শোক হয় তারা ধন্য, কেননা তাদের মিলবে দেবী
সাত্বনা, সাধারণ লোক শোক চায় না, কিন্তু ভক্তের কাছে শোক তাপ বরনীয়।
শোকের মধ্য দিয়ে শোকাতীত ভগবানের স্পর্শে পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্য সেবক গোবিন্দ
অকৃতদার আজন্ম ব্রহ্মচারী, প্রভূর পরম ভক্ত, প্রভুর জন্যে তিনি একটি হরিতকী কর ছিলেন সঞ্চয়।
সেই সঞ্চয়ের অপরাধে প্রভু তাকে সংসারী হবার আদেশ দিয়ে তাকে করলেন ত্যাগ
মূহৎসান গোবিন্দ কালক্রমে সংসারী হলেন, ক্রমে একপুত্র জন্ম দিয়ে স্ত্রী হারালেন।
মাতৃহারা শিশু আর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ তার জীবনকে অধিকার করল সম্পূর্ণরূপে একদিন
নয়ণের মনি পুত্রকে হারালেন গোবিন্দ শোকে কাতর গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ সেবা হয়নি সেদিন।
শ্রীকৃষ্ণই সাত্বনা দিয়ে আবার শ্রীকৃষ্ণকে টেনে নিলেন পুত্রের স্নেহ গিয়ে পড়ল,
পাষান-বিগ্রহে, গোবিন্দ হলেন ধন্য সর্ব ব্যথা, সব শোক তাপ সব নিয়েই বিগ্রহকে লাগলেন ভালবাসতে।
কালক্রমে দেখলেন, কৃষ্ণময় জগৎ, তাই শাস্ত্রে বলেছে “শোক এর পরা পূজা”
বৃহদারণ্যেক উপনিষদে এর ইঙ্গিত রয়েছে, ব্যাধির দ্বারা কেউ যদি সন্তপ্ত হয় তিনি প্রাপ্ত হন পরমগতি।

মম হৃদয়ে বসে রয়েছ তুমি প্রভূ (৬১)

শ্রী অনিল মোহন কর

ধণ ধণা ধণ জীবন

যতড়ান জীবনটা চলছে।

হেলে দোলে, ততড়ান বেঁচে

আছি আমি বলি কাকে,

ডাকি তোমার আনন্দে

তোমার বলে আমি বলীয়ান।

তুমি শুন কি শুন

না, জানিনে আমি, জান

তুমি নিশ্চয়ই, এ ধরায়

নেই কেউ, এ ধরায় আমার।

তুমি বিনা এত কাছে

এ ধরাতে, তুমিই আছ শুধু

আমার সাথে হৃদয়ে রয়েছ

তুমি, কি বলে জানাব তোমায়

সম্ভাষন প্রীতি, জানিনে,

আমি অধম এ ধরা ধামে।

ধন্য আমি জেনে হৃদয়ে

রয়েছ তুমি এ ধরার সর্বে-সর্বা বলে।

সর্বদা করি স্মরন উদ্ধারিও মোরে (৬২)

শ্রী অনিল মোহন কর

ও আমার প্রিয় বন্ধুরে

আমায় আপন ভেবে সব

দিয়েছি তোমারে, তুমি যেমন

চালাও, আমার আর ভাবনা

কিছু নেই, তোমায় তুমি সাধন

কর আমার মত বৃদ্ধভৃত্য দিয়ে।

তুমিই সর্বেসর্বা এ ধরাধামে

বলবার নেই কেউ এ ধরাধামে।

তাই তো সর্বজাতির সর্বজন

তোমার ভাবে এ ধরাতে আর

নেই কেহ তোমার মত

তুমি চিনায়েছ যাদের তুমি কে?

তারাই ধন্য এ ধরায়

প্রণমী তোমায় ও তাঁদেরকে।

তাই তো নিবেদন হাত জোড়

করে তোমায় সর্দাসর্বদা

করি স্মরণ তোমায়, তুমি

উদ্ধার করিও মোরে শেষ দিনে।

বিধি যা কপালে লিখে (৬৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

দারুন বিধিরে তুই লিখে ছিলি

মোর কপালে এত দুঃখ দুর্দ্দশা,

ছোট কালে মরল মাতা, পালন করল

আমায় জেঠিমা তিনিই আমার মা।

আদর যত্নে মানুষ হলেম, দেখলাম

না বিধি তোকে, তুই থাকিস কোথা?

তোর বিধান লিখে সড়ে পড়লি

দেখলাম না তোকে চোখে, ও বিধিরে।

তুই থাকিস, কোথা জানান দে,

রে, বিধি ডাকি তোকে প্রান খুলেরে।

গুরম্ন নামে এক আজব বস্তু রয়েছেন ভবে (৬৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

কোন্ আঙ্গিকে বুঝব আমি
তুমি যে রয়েছ মধ্যমনি হয়ে,
সকল মনুষ্যজাতির দেহে, সে
জ্ঞান কি দিয়েছ তুমি মনুষ্যদেরকে?
আমি পাইনি খোঁজে তোমায়
দেহ মধ্যে, তাই করি কি উপায় এখন।
বলে দাও প্রভু কিভাবে পাব
তোমায়-এ রহস্য জানিনে আমি।
গুরম্ন নামে এক আজব বস্তু আছেন
বলে শুনেছি আমি এক জ্ঞানী লোক থেকে।
তাঁকে খোঁজে বের করব আমি
হন্য হয়ে এভবের মাজারে, হে প্রভু!
ধন্য ধন্য বলো সবে যে গুরম্ন
খুঁজে পেয়েছে এভবে তাঁকে, প্রণমী তাঁকে।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জানাই শ্রীপ্রভুকে ধন্যবাদ (৬৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

এ ভবে কি লাভ হবে আর বেঁছে
একে একে সব সাধ মিঠানো হল জীবনে।
পাপ পূণ্য দুঃখ কষ্ট সব কর্ম মিঠালে
আরও হলো তীর্থ দর্শন ভারতের মধ্যে।
এমন কিছু নেই ভবে করানো হয়নি
আমায় তব গুনে সব করেছি-এ জীবনে।
ধন্য ধন্য করি সদা চরনে পড়ে তব
শোধ করতে পারব না তব ঋণ আমি।
হেন কর্ম নেই ভবে করাওনি তুমি ভবে
ঋণী আমি সদা সর্বদা তোমার শ্রীচরনে।
বাহাত্তর বৎসর বয়সে তুমি নিয়ে গেছ ভারতের
হিমালয়ে গঙ্গোত্রী যমুনেত্রী, কেদারনাথ ও বদরীনাথের দর্শনে।
দড়্গিণে নিয়েছ রামেশ্বর ও কন্যা-কুমারিকাতে
আরও কত তীর্থ করায়েছ দর্শন তব কৃপা বলে।
যেমন করায়েছ দর্শনাদি দড়্গিণেশ্বর, আদ্যপীঠ
বেলুড়মঠ, কালীঘাট, তারাপীঠ, তারেকশ্বর, কামার পুকুর
জয় রামকাটি শ্রীঠাকুরের জন্মস্থান দেড়ে গ্রাম
কাশীপুর, গয়াধাম, বুদ্ধগয়া, বেনারশ, মথুরা, বৃন্দাবন
রামেশ্বর সেতুবন্ধ, কন্যা কুমারিকা ও ভূবণেশ্বর,
কামাড়্গা আরও হিমালয়ের বহু তীর্থ স্থান।
উত্তর কাশী, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, ঋৃষিকেশের অদূরে
সতীদেবীর বাপের বাড়ী, দড়্গারাজের বাড়ী ও আনন্দময়ী মায়ের বাড়ী
জানিনে আমি আর কত আছে বাকী
নিজ ধামে যেতে এখনও বেঁচে আছি শ্রীপ্রভুর কৃপাতে।

শাকৃষ্ণের দরিদ্র ও ভিক্ষুকের প্রতি হৃদ্যতা ছিল অসাধারণ (৬৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

রাজসূয়-যজ্ঞে যাবার পূর্বে যুধিষ্টিরের জরাসন্ধকে বধ করা উচিত এ কথা

যাদবগণ বারবার বলায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবকে ডেকে নেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি আমাদের কর্ত্তব্য অকর্তব্য, ব্যাপারে চিরকাল আমাদের বন্ধু

তোমার মত বিচক্ষান আর কেহ নেই, জবাবে তুমি যা বলবে তাই করব।

স্মরণীয় যে, মগধের দুরাচর জরাসন্ধ প্রায় দুলক্ষ আটশত জন রাজপুত্রকে

বন্দী করে রাখেন, পরম ভাগবত উদ্ধব বয়সে শ্রীকৃষ্ণের ছোট।

তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরামশে ভীমের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন ও

জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে রাজ্যের সিংহাসনে বসায়ে ক্ষাত্রিয়দের মুক্ত করেন।

অবরোধমুক্ত রাজাদের স্ত্মবে প্রসন্ন হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনের জন্য স্মরনীয় উপদেশ করেন

যাহা হল-ঐশ্বর্য মদই মানুষকে উন্মাদ করেও নরকের তিনটি দ্বারের লোভ একটি।

রাজসূয় যজ্ঞের শেষ দিনে শিশুপাল সর্ব-সমক্ষে অত্যন্ত্ম জঘন্য ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে গালমন্দ দেন

মহাভারতে শিশুপালের অশ্রাব্য কটুক্তির বিশেষভাবে জানা যায়।

কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সিংহ যেমন শেয়াল রং

শুনে নীরবে থাকে শ্রীকৃষ্ণও সেরূপ নীরব রইলেন (ভাঃ১০/৭৪)

যাদবগণের আধিপত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজা পাবারযোগ্য তাঁর সমাণ তা তার চেয়ে বড়

আর কেহ নেই সেই যুগে অথচ শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মদের পা দুয়ে দেবার কাজটি স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণই রন্নক্মিনীকে বলেছিলেন যাদের কিছুই নেই তারাই আমাদের প্রিয় ধনীরা প্রায়ই

ভজন করেন না, ভিক্ষুকগণই তার প্রশংসা করেন, দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের প্রতি তার হৃদ্যতা ছিল অসাধারণ।

যাহা এ যুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রেও দেখা যায় দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের প্রতি তাঁর

হৃদ্যতাছিল অপরিসীম, যেমন কোন ধনী ব্যক্তির বাড়ী যাওয়া আমরা দেখতে পাই না।

হে দয়াল প্রভু, বিচার চাই (৬৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

হে দয়াময়, দয়াল প্রভু
তুমি বিচার কর, বিচার কর।
তারা আমায় কেন করছেন
বাড়ী ছাড়া আমার বিচার কর।
বিচার কর, কেন আমায়
পিতৃ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করল।
আমি কি লোভ লালসা
না করায় করল বাড়ী ছাড়া।
প্রভু দয়াময় বিচার কর
বিচার কর, কি অপরাধ আমার।
তোমার ভজনে আমি তৃপ্ত
বলে, সে কি মোর অপরাধ?
হে প্রভু, বিচার কর, বিচার
কর, কেণ করল আমায় বিতাড়িত।

সনাতন ধর্মে পূজাপার্বনের প্রথা জানলে প্রয়োজনে আসবে (৬৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

পূর্ব দিকে দিন মনি সূর্য্য উদিত হয়ে থাকে, তাইতো

সনাতন ধর্মীর পূর্ব দিকে ফিরে পূজা পার্বনের প্রথা রয়েছে।

উত্তর দিকে দেবতাগণের বাস বলে শাস্ত্রে আছে

সে জন্যই সনাতন ধর্মীগণ পূজা পার্বণ উত্তরে ফিরে করে থাকেন।

দক্ষিণ দিকে যমের বাস, তাইতো শ্রাদ্ধপার্বন এদিকে

ফিরে করে থাকেন বলে শাস্ত্রে বিধান, রয়েছে।

পশ্চিম দিকে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামগণকে

পূর্ব দিকে মুখ রেখে ভক্তগণ পূজা পাঠ সম্পন্ন করেন।

এমন প্রথা নাহি কোন দেবদেবীর পূজা পার্বনে

দেবতাগণের রহস্যবৃত্তি মানব জাতির করার কি আছে।

এ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে, পঞ্চ

তত্ত্বকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরম্নৎ কোস বলে।

পঞ্চপলস্নব হল পঞ্চ মহাতত্ত্বের প্রতীক, পঞ্চরত্ন

ক্ষিতি অর্থাৎ মাটির প্রতীক, সশিষ ডাবও পান

পূজান্তে ফললাভের আশার প্রতীক, দুর্বা দেবদেবীর

পূজায় গিট বিহীন প্রদান করতে হয়, আশীর্বাদে গিটযুক্ত দেওয়ার নিয়ম

কারন দুর্বা আয়ুর প্রতীক, দুর্বার, তীক্ষ্ম শিষ

উদ্ধগামীতার নির্দেশক, ধান হল ঐশ্বর্যের প্রতীক।

হরিতকী মঙ্গলকারী শক্তির প্রতীক বলে পূজায়

ব্যবহৃত হয়, এই বিধি মত পূজা হলে শাস্ত্র সম্মত হয়।

তারকব্রহ্ম নাম চার যুগের (৬৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

প্রত্যেক যুগেই একটি বা একাধিক মন্ত্র তারকব্রহ্ম নামরূপেও প্রচলিত রয়েছে।

এর মধ্যে কোন কোনটি প্রণাম মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উলেস্নখিত মন্ত্রগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

সত্যযুগঃ- নারায়ন পড়া বেদা নারায়ণ পরাড়্গারাঃ।

নারায়ন পরামুক্তি নারায়ন পরাগতিঃ।।

ত্রেতা যুগঃ- রাম নারায়ন মুকুন্দ মধুসূদন।

কৃষ্ণ কেশব কং-সারে হরে বৈকুন্ঠ বামন।।

দ্বাপর যুগঃ- হরে মুরারে মধু কৈটভারে

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

যজ্ঞেশ নারায়ন কৃষ্ণ বিষ্ণো

নিরা-শ্রয়ং মাং জগদীশ রড়্গা।।

কলিযুগ :- হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

১৯৯৩ সালের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য হিন্দু ধর্ম শিড়্গা পুস্তকে ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম ছিল।

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বে-ধসে

রঘুনাথায় সীতায়ং পতয়ে নমঃ।।

মৎস্য অবতার (৭০)

শ্রী অনিল মোহন কর

হয়গ্রীব নামে এক রাক্ষাস ব্রহ্মার মুখনিশৃত বেদগুলি চুরি করে পাতালে রেখেছিল লুকায়ে

মৎস্যের রূপে ভগবান হয়গ্রীবকে বধ করে সেই বেদগুলি উদ্ধার করেন।

সত্যব্রত নামে পুরাকালে এক রাজা ছিলেন, তিনি পরম উদার ও ভগবত ভক্ত

এক দিন কৃতমালা নামে এক নদীতে তর্পন কর ছিলেন।

সেই সময়ে অঞ্জলিভরা জলের মধ্যে একটা ছোট মাছ এসে গেলে মাছটি

নিজকে রক্ষার্থে আর্তনাদ করছিল, মাছের আর্তনাদ শুনে মাছটি কর্মন্ডলুভরে নিয়ে আসেন।

কিছুদিন পর মাছটি এত বড় হলো যে, মাছটি কমন্ডলুতে আর রাখা সম্ভব নয়

বলে একটি বড় ঘড়ার মধ্যে রেখে বড় হলে আরও বড় হয়ে গেল।

বড় ঘড়ার মধ্যে আর রাখা সম্ভব নয় দেখে সত্যব্রত মাছটি সমুদ্রে নিয়ে

দিতে নিলে সমুদ্রে গিয়ে মাছটি রাজাকে বলল সমুদ্রে হাঙ্গর বা কুমীর আমাকে মেরে ফেলবে।

মাছের কথা শুনে রাজা চিন্তিত হলেন এবং তিনি হাত জোড় করে প্রার্থনা

করতে লাগলেন, মৎস্যের রূপধারী ভগবান প্রিয়ভক্ত সত্যব্রতকে কিছু কথা বলেন।

আজ থেকে সপ্তম দিনে এই ত্রিভূবণ প্রলয় কালীন জল রাশিতে ডুবে যাবে

সে সময় আমি একটি বড় নৌকা তোমার কাছে আমি পাঠাব।

তুমি সমস্ত রকমের বীজ পশুপাখী গাছ পালা সমস্ত শস্য বীজ নিয়ে নৌকায় এসে থাকবে

অনেক ঝড় তুপান হবে আমি তোমাদের রক্ষা করব।

যেমনি কথা তেমনি কাজ গুরম্ন হয়ে গেল, সেই সময় সপ্তষিদের

নির্দেশে রাজা সত্যব্রত ভগবানের ধ্যান করলে জল সমুদ্রে মৎস্যরূপ ধারন করেন।

এর পর ভগবান প্রকট হলে এবং তিনি প্রলয় সমুদ্রে বিহার করতে করতে

সত্যব্রতকে জ্ঞান ভক্তির উপদেশ দান করতে থাকেন।

কর্ম অবতার (৭১)

শ্রী অনিল মোহন কর

অতি প্রাচীন কালে দেবতা রাক্ষসদের মতভেদের দরুন পারস্পারিক শত্রুতা বেড়ে যায়

তাই প্রায়ই দুপক্ষের মধ্যে নানাভাবে যুদ্ধ বিবাদ হয়ে থাকত।

একবার রাক্ষসদের আক্রমনে সব দেবতারা ভয়ে পালাতে পালাতে ব্রহ্মার কাছে হাজির

ব্রহ্মার পরামর্শমত দেবতারা সকলে মিলে জগৎ গুরুর প্রার্থনা করল শুরু।

এ প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ভগবান বলেন তোমরা দৈত্যরাজ বলির সাথে দেখা কর

এবং তাকে নেতা করে দাণব ও দেবতা মিলে সমুদ মন্থণ শুরু কর।

সমুদ্র মন্থণের ফলে অমৃত উত্থিত হবে সেই অমৃত পাণ করলে তোমরা অমর হবে

একথা জানায়ে ভগবান অন্তর্ধাণ হলেন এবং শুরু হল সমুদ্র মন্থন।

কিন্তু মন্থণ শুরু হলে মন্দর পর্বত সমুদ্রের জলে ডুবে যেতে আরম্ভ হল

তখন সকলে ভয়ে বিবত হয়ে হতাশ হয়ে পুনঃ ভগবানের শরণাপর্ণ হল।

ভগবান হেসে বলেন তোমরা যে কোন কাজ করার পূর্বে গণেশ পূজা করা উচিত

তাই তাঁরা কার্য সিদ্ধির জন্য দেবতা গণেশের পূজা শুরু হল।

একদিকে গণেশের পূজা হচ্ছে আর আরেক দিকে প্রভু কুর্ম অর্থাৎ কচ্ছপ

রূপ ধারন করে মন্দর পর্বতকে নিজের পিঠে বসায়ে দিলেন।

কিন্তু বহু সময় কেটে গেলেও কোন অমৃত উঠল না, তখন ভগবান সহস্রবাহু হয়ে

নিজেই মন্থন শুরু কালে প্রথমে ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হলে শিব ঠাকুর পান করেন।

সেই থেকে শিবের আরেক নাম হল নীলকণ্ঠ এভাবে কামধেনু, উদ্বৈশ্রবা নামের ঘোড়া

হাতী, কৌস্তুবমনি, কল্পবৃক্ষ, অপসরা বৃন্দ, লক্ষ্মী, বারণীধনুক, চন্দ্র, ধন্বন্তরি, বৃক্ষ ও শেষে অমৃত উঠল।

অমৃতের জন্য দেবতা ও দানবদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া শুরু হলে ভগবান লীলা করে

দেবতাদের দিলে দেবতারা অমৃত পান করে অমর হলেণ ও যুদ্ধে দেবতারা জয়ী হলেন।

দেবতারা সেই অমৃত পাণ করে হলেন অমর, আর সর্বকাজেই প্রথমে গণেশ পূজা

করে সকল কর্ম করতে হবে, কোণ কর্মে অহংকার করা যাবে না।

বরাহ অবতার (৭২)

শ্রী অনিল মোহন কর

প্রলয় জলধিতে ডুবে থাকা পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান একবার বরাহ শরীর ধারন করেন
স্বায়ম্ভূব মনু একবার বিনিতভাবে হাত জোড় করে পিতা ব্রহ্মাকে বলেন আপনিই সমস্ত প্রাণীর জন্মদাতা।
আপনাকে প্রণাম, আমি কোণ কাজ দ্বারা যৎসামান্য সেবা করলে আমি কৃতার্থ হব
আমাকে সেবার অনুমতি দিন, ব্রহ্মা বলেন পুত্র তোমার কল্যাণ হউক।
পিতার আজ্ঞাবহ পুত্রের কাজ তাই কল্যাণ হউক তোমার ইহাই পুত্রের কর্ত্তব্য
তাই তুমি ধর্ম সম্মতভাবে পৃথিবীকে পালন করও যজ্ঞ দ্বারা শ্রীহরির আরধনা কর।
মনু তখন বলেন, অবশ্যই আপনার আদেশ পালন করব, তবে সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন
আমি এই পৃথিবীকে কি ভাবে পালন করব, পৃথিবীর অবস্থা শুনে ব্রহ্মা খুবই চিন্তিত হলেন।
তখন পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য তাঁর নাক থেকে হঠাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলীর সমান এক
বরাহ শিশু বের হয়ে এল, দেখতে দেখতে সেই শিশু পর্বত প্রমান হয়ে গর্জন শুরম্ন করেন।
ভগবানের মায়া বুঝতে ব্রহ্মার দেরী হল না তখন করজোড়ে তাঁর স্তুতি করতে শুরম্ন করেন
ব্রহ্মার স্তুতিতে বরাহরূপী ভগবান খুশী হয়ে জলে ডুব দিলেন।
একটু পরেই জলমগ্ন পথিবীকে নিজ দাঁতের উপর রেখে রসাতল থেকে
ওপর উঠালেন, তবে জলের মধ্যে মহাপরাক্রমশালী হিরন্যাড়্গা জলেই গদা দিয়ে আক্রমণ করেন।
কিন্তু ভগবানের ক্রোধ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় লীলাছলে হিরন্যাড়্গাকে বধ করেন যেমনটি
সিংহ যেমন হাতীকে বধ করে, স্থল থেকে উঠে এলে সব দেবতা স্তুতি করতে লাগলেন।
সেই স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে, বরাহরূপী ভগবান নিজের ড়্গুরের দ্বারা জলকে আটকে রেখে
তার উপর পৃথিবীকে রেখে দিলেন, বরাহরূপী অবতারকে আমরা সকলের প্রমান।

নৃসিংহ অবতার (৭৩)

শ্রী অনিল মোহন কর

হিরণ্য কশিপু খুবই ক্রুদ্ধ হল তার ভাই হিরণ্যাক্ষ বধ হলে, তখন সে ভগবানের

মহাশত্রুতে পরিনত হলে সে অজেয় বর লাভের জন্য শুরম্ন করল কঠোর তপস্যা।

সেই তপস্যার ফলে সে ব্রহ্মার কাছ থেকে দেবতা মনুষ্য বা পশু ইত্যাদির হাতে

মৃত্য হবে না বর পেয়ে সে অজেয় হল এবং তার প্রতাপ খুব বেড়ে গেল।

দেব দানব সকলেই তার চরন বন্দনা করত ও যারা ভগবানের পূজা করত

তাদের কঠোর শাস্তিম্ম দিত, তার অত্যাচারে লোক ও লোক পালেরা অতিষ্ট হয়ে উঠল।

দৈত্য রাজের অত্যাচারে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগন, দেবগণের স্তুতিতে ভগবান

নারায়ন হিরন্য কশিপুকে বধের আশ্বাস দেন, দৈত্যরাজের অত্যাচার প্রবল থেকে প্রবলতর হল।

এমনকি ভগবানের নাম কীর্ত্তণের অপরাধে নিজের ছেলে প্রহ্লাদকে পর্যন্তম্ম হাজার রকম

শাস্তিম্ম দিত, অথচ প্রহ্লাদ খেলাদুলা না করে ছোট্ট বয়সেই ভগবানের ধ্যান করত।

প্রহ্লাদ ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত ছিলেন যে, মাঝে মাঝে অসুর বালকদের ধর্ম উপদেশ

দিতেন, এ কাজের ব্যাপারে হিরণ্যকশিপু ভীষন ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহ্লাদকে রাজ সভায় যেকে আনল।

খুবই নম্রভাবে প্রহ্লাদ, হাত জোড় করে দৈত্য রাজের কাছে এসে দাঁড়ালে দৈত্যরাজ ক্রুদ্ধভাবে তুই

বড়ই উদ্ধত হয়ে গেছিস যে, তুই কার শক্তিতে আমার আদেশের বিরম্নদ্ধে কাজ করছিস।

প্রহ্লাদ জবাবে বলেন-পিতা, ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্তম্ম সকল প্রাণীকে ভগবানেই তার

বশবর্তী করে রেখেছেন, সেই পরমেশ্বরই নিজের শক্তিতে এ বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতিও সংহার করেন।

আপনি দয়া করে এ অসর প্রবৃত্তি ত্যাগ করম্নন নিজের মনকে সকলের প্রতি উদার করম্নন

প্রহ্লাদের কথা শুনে হিরন্যকশিপুর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তোর ভগবান কি এ স্তম্ভের ভিতর আছে?

তা হলে মুষ্ঠাঘাত করে দেখি বলে তাঁর পিতা পচন্ড শক্তিতে মুষ্ঠাঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে

স্তম্ভের ভেতর থেকে নরসিংহরূপ-ধারী ভগবান আর্বিভূত হলেন।

এর অধ্যাংশ সিংহের মত অধ্যাংশ মানুষের মত মুহুর্তের মধ্যে ভগবান হিরণ্যকশিপুর জীবন লীল শেষ করে প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আদর করলেন।

বামন অবতার (৭৪)

শ্রী অনিল মোহন কর

প্রাচীন কালে যুদ্ধে ইন্দ্রের কাছে পরাজিত, হয়ে দৈত্যরাজ বলি গুরম্নদেব শুক্রাচার্যের শরনাগত হয়ে শুক্রার্য বলির মনে দৈবভার জাগিয়ে তুললেন।

শুরম্নর কৃপায় বলি স্বর্গ অধিকার করল প্রচুর বিচিত্র লীলা খেলায় দেবরাজ ইন্দ্র এখন পথের ভিখারী বলে তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

শেষে নিজের মা অদিতির কাছে গিয়ে তাঁর শরন নেন, ছেলের দুঃখে ব্যথিত হয়ে অদিতি পরো ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রতের শেষ দিনে আবির্ভূত ভগবান।

ভগবান অদিতিকে বলেন নিশ্চিন্ত্ম থাক তুমি, তোমার পুত্ররূপে জন্ম নেব ইন্দ্রের ছোট ভাই হলে তাঁর মঙ্গল কবর বলে তিনি অন্ত্মহিত হলেন।

অবশেষে অদিতির গর্ভে থেকে ভগবান বামনরূপে অবতীর্ণ হল পুত্ররূপে তাঁকে পেয়ে আনন্দিত হলে দেবতা ও মহর্ষিগনও আনন্দিত হন।

ভগবান বামনরূপে ব্রহ্মচারীর বেশে দেখে যথাসময়ে উপনয়নাদি সম্পন্ন করলেন, তবে ভগবান বামন অবগত হলে বলিরাজ ভৃগু কচ্ছ নামক জায়গায় অশ্বমেদ যজ্ঞ করেন

তখন ভৃগু কচ্ছের পথে, যাত্রা করেন ভগবান বামন কোমরে মঞ্জু সূতার কৌপান এবং কাধে পৈতা ধারন ও বগলে মৃগচমের আসন ও মাথায় জঠাভার ছিল।

একজন বেঁটে ব্রাহ্মণের বেশে ভগবান বলির যঞ্জস্থলীতে উপস্থিত হলে বলি আনন্দে উলস্নসিত হয়ে ভগবানকে বসার শেষ্ঠ আসন দিয়ে নানা উপাচারে ভগবানের পূজা করেন।

বলি ব্রাহ্মনরূপী ভগবানকে কিছু যাচনার জন্য অনুরোধ করলে ভগবান তিন পদজমি ভিক্ষা চাইলে কিন্তু শুক্রাচার্য্য প্রভুর লীলা বুঝে বলিকে দান দিতে নিষেধ করেন।

কিন্তু বলি সত্য পালন থেকে বিচ্যুত হলেন না, তিনি সঙ্কল্প করার জন্য জলপাত্র হাতে নিলে শুক্রাচার্য নিজের শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সূক্ষ্মদেহে জলপাত্রে ঢুকে একটি কুশ ডুবায়ে কমন্ডলুর মুখ বন্ধ করে দেন।

শুক্রাচার্যের একটি চোখ কুশের খোঁচায় নষ্ট হয়ে গেল, বলির সঙ্কল্প শেষ হওয়া মাত্রই ভগবান বামনদেব একপদে পৃথিবী অপরপদে স্বর্গ মেপে দিলেন।

তৃতীয় পদ রাখার জন্য বলি নিজের মাথা পেতে দিয়ে নিজকে সঁপে দিলেন।

ইন্দ্রকে স্বর্গের রাজা করে দিলেন ও ভগবান বামন দ্বারপালরূপে রাজা বলিকে দর্শন দিলেন।

পরশুরাম অবতার (৭৫)

শ্রী অনিল মোহন কর

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীতে হৈহয় বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের অত্যাচারে লোকের হাহাকারে

পরিণত ব্রাহ্মন ও সাধুরা অসহায় হয়ে পড়লে ভগবান পরশুরাম জমদগ্নি ঋষির পুত্র

ঐ হৈহয় বংশে রাজা সহস্রবাহু অর্জ্জুন খুবই অত্যাচারী ও ক্রুর শাসক ছিলেন।

তিনি এক সময়ে জমদগি ঋষির আশ্রমে এসে সমস্ত্ম গাছ পালা ধ্বংশ করে ঋষির গরম্নও লুন্ঠন করেন।

এ দুস্কীতির সংবাদ জেনে পরশুরাম সহস্রবাহু অর্জ্জনকে বধ করলে সহস্রবাহু ও মৃত্যু হলে

তাঁর দশহাজার ছেলে ভয়ে অন্যত্র পালায়ে যান কিন্তু পিতার মৃত্যুর কথা ভুলতে পারেননি।

একদিনের ঘটনা পরশুরাম তাঁর ভাই এর সাথে আশ্রমের বাহিরে গেলে সুযোগ পেয়ে

সহস্রবাহুর ছেলেরা সেখানে হাজির হয়ে মহির্ষ জমদগ্নিকে একা পেয়ে করল হত্যা।

তাঁর সহধর্মিনী রেনুকা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলে পরশুরাম দূর থেকে তাঁর মায়ের

কান্না শুনতে পেয়ে দ্রম্নত গতিতে আশ্রমে এসে দেখেন তাঁর পিতাকে হত্যা করা হয়েছে।

পরশুরাম শোকে ও ক্রোধে আছন্ন হয়ে পিতার মৃতদেহ তাহাদের সমর্পন করে কুঠার

হাতে ক্ষত্রিয়দের নিধনের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন, সে সময়ে ক্ষত্রিয় রাজারা অত্যন্ত্ম অত্যাচারী ছিলেন।

তাই নিজের পিতা হত্যার প্রতিশোধ নেবার তরে পৃথিবীর ক্ষত্রিয়দের পরশুরাম

হত্যা করলেন, এভাবে ভগবান ভৃগুবংশে অবতার গ্রহণ করে সব ক্ষত্রিয়দের একুশ বারে বধ করেন।

তারপর পরশুরাম নিজেই পিতাকে জীবিত করলেন, জীবন ফিরে পেয়ে জমদগ্নি

সপ্তষিমন্ডলের সপ্তম ঋষির স্থান পেলেন ও পরশুরাম যজ্ঞ করে সমগ্র পৃথিবী দান করে মহেন্দ্র পর্বতে চলে যান।

রাম অবতার (৭৬)

শ্রী অনিল মোহন কর

অনেক আগেকার কথা জয় ও বিজয় নামে ভগবানের দুজন দ্বারপাল ছিল, সনক প্রভৃতি ঋৃষিদের শাপে তারা রাড়্গাসকুলে জন্মে নাম হয় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ।

দুই রাড়্গাসই ঘোরতর অত্যাচারী হয়ে তাদের প্রাপ কর্মে মাতা ধরিত্রী অতিষ্ট হয়ে উঠে

তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের গিয়ে ভগবানের শরননেন ও প্রার্থনায় অযোধ্যায় রাজা দশরথের পুত্র হয়ে জন্ম নেন।

নাম হল রাম চন্দ্র, কৌশল্যা মাতা, বালক বয়সেই বহু রাড়্গাস বিনাশ করেন, সুবাহু ও অন্যান্য রাড়্গাসেরা ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নষ্ট করলে রাম তাদের সংহার করেন।

মিথিলার রাজা জনকের কন্যা সীতাকে ধনুক ভেঙ্গে বিবাহ করেন স্বয়ংবর সভায় পিতা দশরথের সত্য রড়্গার জন্য ভগবান রামচন্দ্র বনে গমন করেন।

তাই লক্ষ্মন ও সীতাকে নিয়ে তিনি বনবাসে গমন করেন, তখন অত্যাচারী রাবন লঙ্কার রাজা ছিলেন, রাজার বোনের নাম ছিল সূর্পন-খা, সে দুরভি সন্ধি নিয়ে বনে আসে।

রাম চন্দের কুটিরে আসলে লক্ষ্মন তার নাক কেটে দেন, তাতে সূর্পণখার ভাই খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি মিলে রাম লক্ষ্মনকে আক্রমন করলে ভীষন যুদ্ধ হয়।

এক সময়ে বনের কুটির থেকে রাবন সীতা হরন করে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে রেখে দেন জঠায়ু রামচন্দ্রকে সীতা হরনের সংবাদ দিলে জঠায়ু রাবণের অশ্রাঘাতে মারা যায়।

সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র ও বানর রাজের ভাই সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন ও পরে তিনি রাবন রাজ বালিকে বধ করলে সুগ্রীবের অনুচর হনুমানজী লঙ্কায় যান।

সেখানে সীতার সাড়্গ্যাৎ পেয়ে রামকে খবর দিলে রাম অসংখ্য বানর নিয়ে সমুদ্রের তটে-পৌছে সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে রাবনের ভাই বিভীষনের সহায়তা পান।

রাম রাবনের যুদ্ধে লঙ্কায় সবংশে রাবনকে নিহত করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করেন পরে বিভীষনকে লঙ্কায় রাজা করে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার (৭৭)

শ্রী অনিল মোহন কর

শুরসেন রাজার ছেলে বসুদেব বিয়ে করেন, দেবকীকে বাড়ী যাওয়ার জন্য রথে উঠেন, কংশ খুড়তুতো বোনকে খুশী করার জন্য নিজেই রথ চলাতে থাকেনভ

কংশ রথ চালাবার সময়ে দৈব বানীতে শুনতে পেল দেবকীর অষ্টম ছেলে জন্মালে কংশকে বধ করবে, তাই কংশ দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হল।

বাসুদেব কংশের কাছে প্রতিজ্ঞা করল দেবকীর প্রত্যেক সন্ত্মানকে কংসের হাতে সমর্পন করবেন, এভাবে দেবকীকে তিনি রড়্গা করেন।

কংশ দেবকী ও বাসুদেবকে কারাবন্ধী করে রাখল ও সন্ত্মান জন্মালে প্রত্যেক সন্ত্মানকেই হত্যা করতে লাগল, অবশেষে অষ্টম সন্ত্মান জগতের ত্রাণকর্ত্তা নারায়ন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হল।

বাসুদেবের অষ্টম সন্ত্মান জন্ম নিলে যোগমায়ার প্রভাবে কারাগারের দরজা খুলে গেল বাসুদেব শিশু শ্রীকৃষ্ণকে একটি কুলাতে শোয়ায়ে মাথায় করে গোকুলে যাত্রা করেন।

পথে যমুনা নদী প্রভুর স্পর্শে যমুনার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করেন বাসুদেব নন্দরাজের বাড়ী গিয়ে নিজের ছেলেকে যশোদার পাশে শুইয়ে দিলেন।

যশোদার সদ্যজাত কন্যা সন্ত্মানকে নিয়ে পুনঃ কারাগারে ফিরে আসেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে নন্দরাজের ও যশোদার ও সমগ্র গোকুলে আনন্দে মেতে উঠল।

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালেই সকলকে আনন্দে মুগ্ধ করে রাখতেন, গোপীদের মাখন চুরি করতেন মাখন অন্য ছেলেরাসহ খেত ও খেলার ছলে পুতনা, বকাসুর প্রভৃতি রাড়্গাস দানবদের বিনাশ করেন।

একদিন খেলার ছলে বল যমুনার জলে পড়লে তোলার জন্য যমুনার জলে লাফ দিয়ে পড়লে কালীয় নামে বিষধর নাগের ফলার উপর নৃত্য করতে লাগেন।

কিছু কাল পরে শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের সাথে গোকুল থেকে মথুরায় আসলে অত্যাচারী কংশ প্রভৃতি অসুরদের সংহার করে নিজের মাতা-পিতাকে বন্দিদশা হতে মুক্ত করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সকল অমরবানী গীতায় সকালের মঙ্গল করে যাচ্ছে ও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছে লীলা পুরম্নষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সকলে প্রমাণ করি।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু (৭৮)

শ্রী অনিল মোহন কর

বাংলাদেশের সিলেট জেলার ঢাকা-দড়িান গ্রামে শ্রীজন্নাথ পিতা ও মাতা শচীরানীর গর্ভে আসলে স্বপ্নে আদিষ্ট হয় নবদ্বীপ চলে গেলে সে-খানেই ভূমিষ্ঠ হন।

শোভাদেবী মহাপ্রভুর ঠাকুর মা স্বপ্নে আদিষ্ট হলে তাঁর পিতা মাতা নবদ্বীপে চলে যান তবে নাতি ভূমিষ্ঠ হলে তাঁকে শর্ত্ত পূরনার্থে শ্রীহটে পাঠালেন।

ভূমিষ্ঠ হলে পর সারা নবদ্বীপে মহিলাদের উলুধ্বনি ও পরম্নষদের হরি ধ্বনি পড়ে যায় ক্রমে বড় হতে থাকলে বিদ্যাবুদ্ধিতে সুপন্ডিত হতে থাকলে অদ্বৈত আচার্য্য সাধক পরিচয় ঘটে।

মহাপ্রভু শোভাদেবীর মনোবাঞ্চা পূরনের জন্য একবার ছোট্ট ছেলে বয়সে অলৌকিভাবে শ্রীহটের ঢাকা দড়িান গ্রামে সাড়্গাৎ দিয়ে যান বলে লেখা রয়েছে যাহা বই পুস্ত্মকে দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমানে সিলেটের ঢাকা-দড়িান গ্রামে মহাপ্রভুর বংশধর শ্রী রাধা বিনোদ মিশ্র নামে পরিচিত বর্তমানে তিনি বেঁচে আছেন ও মহাপ্রভুর সেবা পূজা মন্দিরে হয়ে থাকে।

চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের অবতার বলে গন্য হলেও কতক ব্রাহ্মন তাঁর ভাবধারাকে প্রাধান্য দেন না, তাঁর প্রভাব পুরি মন্দিরে পান্ডাদের আচরনে পরিলড়্গিত হয়।

চৈতন্য মহাপ্রভু গুহ্য হরিনাম মানুষের মধ্যে প্রচার করায় কতক ব্রাহ্মনের হিংসার কারণ মহাপ্রভুর এভাব সকলেরই উদ্ধারের তরে বিধায় গরীব ধনী ও সকল জাতি প্রথা রহিত হয়ে যায়।

শাস্ত্রমতে কল্কি অবতার শেষ হয়ে অবতার রূপী ভগবান লুকায়ে থেকে শাস্ত্র শিড়্গা নিচ্ছেন কারন সনাতন ধর্মীয়গন ধর্মের কথা গুনেন বটে পালন করেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর্বিভাব থেকে সত্য যুগের আগমন ঘটেছে স্বামী বিবেকানন্দজী ধারণায় জানা যায়, তাই তো মা সারদাদেবীও স্বামীজি কায়স্ত্ম সন্ত্মান হলেও ঠাকুর আসনে স্থান দিয়েছেন।

কল্কি অবতার (৭৯)

শ্রী অনিল মোহন কর

ভগবান কল্কিকে দশম অবতার বলে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কলিযুগ যেমন যেমন বৃদ্ধি পাবে সাথে ধর্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু ও শক্তি কম হতে থাকবে।

কলিযুগে যার টাকা আছে তাকেই লোকে কুলীন সদাচারী ও সৎগুনী বলে সম্মান করবে যে যত ছল-কপঠতা করতে পারবে তাকেই বাস্ত্মব বাদী বলে গন্য হবে।

ব্রাহ্মণের পরিচয় তার গুন বা ব্যবহারে বোঝা যাবে না, তার পরিচয় শুধু যজ্ঞোপবীত দ্বারা হবে, সমস্ত্ম পৃথিবী দুষ্টদের জয় জয়কার, রাজা হবার নিয়মনীতি থাকবে না।

ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শুদ্রের মধ্যে যে বলবান হবে সেই রাজা হয়ে বসবে সে সময়ের অধম রাজা অত্যন্ত্ম নির্দয় ও ক্রুর হবে, তার ভয়ে প্রজারা পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাবে।

সে সময়ে লোকের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নানা প্রকার দুশ্চিন্ত্মায় কাতর থাকবে ও গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারন করবে, চুরি, জোচ্চুরী ও হিংসা কু-কর্মের দ্বারা মানুষ জীবিকা নির্বাহ করবে।

কলির মানুষের শরীরের আকৃতি ছোট হয়ে যাবে, চার বর্ণের মানুষ শূদ্রের সমার্ন হবে গাভীদের বাছুর আকতিতে ছোট হবে ও দুধ পরিমানে কম হবে।

বাণপ্রস্ত ও সন্যাসীরা গৃহস্থের মত হবে মানুষেরা সব শাস্ত্র নিয়ে হাসাহাসি করবে বেদ-পুরানের নিন্দা করবে, পুজাপাঠকে শুধুমাত্র আড়ম্বর মনে করবে।

ধর্মে পাষন্ডদের প্রাধান্য হবে এভাবে কলির অন্ত্মিম সময় পৃথিবীতে হিংসা ও দলবাজী বাড়বে এমতাবস্থার মধ্যে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতার গ্রহন করবেন।

কলিযুগের অন্ত্মিম লগ্নে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুষশা নামে ব্রাহ্মন জন্ম নেবেন তিনি অতীব উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন ও ভগবানের পরমভক্ত হয়ে তারই ঘরে ভগবান কল্কি অবতার অবতরন করবেন

তিনি দেব দত্ত নামে ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে তলোয়ার দিয়ে দুষ্টের মাথা কাটবেন তিনি বিলুপ্ত ধর্মের পুণঃ প্রতিষ্ঠা করবেন, ও সত্য যগ আরম্ভ হলে সকলে সুখে থাকবেন।

গরীবের প্রতি দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব (৮০)

শ্রী অনিল মোহন কর

স্বামিজী মহারাজের পিতৃ বিয়োগ হলে অত্যন্ত্ম দুর্ঘনা-গ্রস্ত্ম খেতে পান না, পরনে কাপড় নেই, দুরাবস্থা যতদূর হতে পারে ততদূর পৌঁছে গেছে।

সে সময়ে তাঁর এক টাকা-ওয়ালা বন্ধুর সাথে দড়িাণেশ্বর উপস্থিত, ঠাকুর তখন তাঁর বন্ধুকে বলেন নরেনের বাবা মারা গেছে ওদের বড় কষ্ট।

এখন বন্ধু বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়, বন্ধু চলে গেলে পরে নরেন ঠাকুরকে ভৎর্ষনা করেন, কেন আপনি ওর কাছে এসব কথা বললেন।

তিরস্কৃত হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে শ্রীরামকষ্ণ উত্তর দিলেন ওরে তোর জন্য আমি যে দ্বারে দ্বারে ভিড়্গা করতে পারি, কিন্তু ভিড়্গা করতে হয়নি।

ভাবটা দেখা যায় অপরের জন্য যখন প্রাণটা কাঁদে উঠে, তখন দ্বারে দ্বারে ভিড়্গা করাও চলে, এটা হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব।

আরেকটি ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ দেব প্রায়ই কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলতেন একদিন এমনি ভাবের কথা চলছে তখন শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলেন সংসারে থাকলে এমনি চাই, সঞ্চয় ও চাই।

পাঁচটা দান-ধ্যান-দয়া, তাতে ঠাকুর উত্তর দিলেন দান-ধ্যান-দয়া কত নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচা, আর পাশের বাড়ীতে লোক খেতে পাচ্ছে না।

তাদের দুটো চাল দিতে কষ্ট হয় অনেক হিসেব করে দিতে হয়, খেতে পাচ্ছে না লোক তা আর কি হবে ও শালারা মরন্নক আর বাঁচুক আমি আর বাড়ীর লোক ভালই থাকলেই হল।

মুখে বলে সর্বজীবে দয়া, কথাটার তাৎপয্য দাঁড়াল কি? তোমার যদি থাকে তাহালে নিজে ভোগ না করে, অপরের দিকে তাকিয়ে তাদের সহমর্মী হয়ে তাদের জন্যে কিছু করা।

গুরন্নধরা হল না আমার (৮১)

অনিল মোহন কর

হায়রে চোক বুঝলে দুনিয়া আঁধার

হেলায় হেলায় জীবন গেল আমার।

এখনও আমি চিনলাম না আমার

প্রাণদাতাকে, এ ভব সংসারের মাঝারে। ঐ

আমি আমি বলি সদা, কে আমার

পাটাল বলে এ ধরায় তাঁকে তো চিনলাম না।

এখন করি উপায়, জীবন গেল

আমার গুরন্ন ধরা হলো না যে আমার। ঐ

গুরন্ন যদি ধরতে না পারি আমি

জীবনটা যাবে চলে ছারে খাড়,

গুরন্ন দয়া করে দাও দেখা মোরে

তুমি আছ কোথা আমি তো গেলাম ছাড়ে খারে। ঐ

শ্রী প্রভুর চরণ ভিক্ষার তরে আমি কাঙ্গাল (৮২)

অনিল মোহন কর

আমি তাঁর দুয়ারে শ্রীচরণ ভিক্ষায়

তবে যার কি করে, কে আছ দয়াল,

বলে দাও মোরে রাস্ত্মার ঠিকানাটা

হাতে ধরি, পায়ে পড়ি, বলি হাত জোড়ে।

দিন তো চলে গেল শ্রীচরণ তো

পেলাম না, এখন করি কি উপায় আমি।

শুনেছি তিনি ভক্তের তরে সব বিলয়ে

দিয়ে আনন্দে চলেন সর্দা ভক্তের অন্ত্মরে।

হেন দিন-মনি দেখলাম না চোকে

জীবনটা তো আমার গেল বৃথা হয়ে।

অগতির গতি তুমি দেখা দাও মোরে

হে, প্রাণন-নাথ দেখাও তব শ্রীচরণ দু'খানি

এখন সুভাষিত হরিনকস্ত্মরি সম তব চরন থাকিলে

মস্ত্মকে মম মোড়োর দরজা খুলবে আপনি আপনি।